অ্যালবামে কয়েকটি ছবি

রমাপদ চৌধুরী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

'They did not know that they were there,
and yet they did know'

জাঁ ক্রিস্তফ থেকে

অ্যালবামে কয়েকটি ছবি

অ্যালবামে পর পর তিনখানাই নিরুপমের ছবি। প্রথম ছবিখানা দেখে অলকা একদিন বলেছিল, তখন তুমি দেখতে বেশ ভালই ছিলে, বেশ ইনোসেন্ট ইনোসেন্ট।

ঐ ছবিখানার সঙ্গে অলকার কোন সম্পর্ক নেই, ওটা বিয়ের অনেক আগেকার ছবি। পরের ছবিতে অলকাও আছে, বিয়ের সময়ে তোলা ফোটোগুলো তো তেমন সুন্দর হয়নি ; তাই বিয়ের মাসখানেক পরে একটা স্টুডিওতে গিয়ে ওরা তুলিয়ে এসেছিল। এর পরের ছবিটা খুব বেশী দিনের নয়। নিরুপমের এক সহকর্মী বন্ধু পাসপোর্ট করানোর প্রয়োজনে ফোটো তোলাতে গিয়েছিল অফিস থেকে ফেরার পথে, নিরুপম সঙ্গে ছিল। বন্ধুটি জোর করে একটা ফোটো তুলিয়ে দিয়েছিল। গরম কোট, গলায় টাই বাঁধা, চোখে মোটা ফ্রেমের শ্যেলের চশমা। একেবার পাক্কা সাহেব।

ও যে একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের একজন অফিসার, ছবিটা দেখলেই বোঝা যায়। যে দেখেছে সেই বলেছে, খুব সুন্দর। অলকার এক মাসতুতো বোন এই কিছুদিন আগে এসেছিল, ছবিটা দেখে বলেছিল, যাই বল্ মেজদিভাই, তোর বরটা কিন্তু দারুণ হ্যাণ্ডসাম। অথচ এই ছবিটা অলকার পছন্দ নয়। হাসতে হাসতে একবার বলেছিল, এটা দেখলেই মনে হয় তোমার মধ্যে তুমি নেই।

প্রায় দার্শনিক কথা। কিন্তু অ্যালবামের পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে পর পর তিনখানা ছবিই দেখলো নিরুপম, তারপর নিজের মনেই যেন বললে, কোনটিতেই আমার মধ্যে আমি নেই।

ও প্রথম দিকের পাতা উল্টে আরেকবার গ্রুপ ফোটো-গ্রাফখানা দেখলো।

নিরুপমের কাছে ছেলেবেলার কিংবা বিয়ের আগে যত ছবি ওর দেরাজে পড়েছিল একটা বাণ্ডিলের মধ্যে, বউভাতে উপহার পাওয়া বড় এ্যালবামটায় সেগুলো যত্ন করে এঁটে রেখেছিল অলকা। তারপরে তোলা ছবি দিয়ে পরের পাতাগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ না থাকলে একা একা সময় কাটাতে ওর জুড়ি নেই।

এখন অলকা নেই, বুবুন নেই, ইলু নেই। নিরুপমের কিছু করারও নেই। তাই চুপচাপ বসে বসে অ্যালবামটা দেখছিল। গলায় টাই-বাঁধা ছবিটা আরেকবার দেখে নিরুপমের মনে হল অলকা ঠিকই বলেছে, আমার মধ্যে আমি নেই।

অলকাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার পর থেকে তা যেন বেশী করে বুঝতে পারছে।

নিরুপমের এক এক সময় মনে হয় ও কেমন যেন অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। এই অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে চমৎকার একটা আয়েশের ভাব আছে। কয়েক বছর আগেও ওর মধ্যে একটা যুবক-যুবক ছটফটে বিলাস ছিল, কাজে না হলেও, চিন্তা ভাবনায়। নিরুপম তখন অনেক কিছু কল্পনা করতে পারতো, মনের কোন কোন সাধ পূরণ করার ইচ্ছে হত। এখন কিছুই আর ইচ্ছে করে না। কানের দুপাশে, জুলফিতে, কয়েকটা সাদা চুল ওকে বিব্রত করার বদলে বরং ওর মনে কিছুটা উপভোগ্য কৌতুক জাগিয়ে তোলে। ছুটির পর নিরুপমের যে ব্রিজ খেলার

আড্ডা ছিল, তার আকর্ষণ অনেক কাল আগেই হারিয়ে গেছে, ক্লাবে গিয়ে রোয়িং করতে কিংবা টেবল-টেনিস খেলতেও মন রাজি হয় না, বন্ধুবান্ধবদের মুখগুলো কেমন বিরস লাগে। অথচ এক একদিন এই গণ্ডীর ভেতর থেকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার অদম্য আগ্রহটুকু চাপা দেবার জন্যে ও চেন-স্মোকারের মত একটা সিগারেট শেষ হতে-না-হতেই তা থেকে আরেকটা ধরায়, ধরাবার সময় ওর হাত, হাতের আঙুল কাঁপতে থাকে।

তাই অলকার ছোট্ট বাসনাটুকু ও যদিও মোমবাতি নিভোনোর মত করে ফুঁ দিয়ে এবারকার মত চাপা দিতে পারতো, তবু খেয়ালের বশে উৎসাহই দিয়ে বসলো। পর পর কয়েক বছর ধরেই অলকা বাপের বাড়ি যাবার কথা তুলেছিল। নিরুপমকে কিন্তু কোন বারই বাদ সাধতে হয়নি। বুবুন ও ইলুর ইস্কুল আছে, পরীক্ষার পড়া আছে, গরমের সময় জামসেদপুর একেবারে ফার্নেস, যেতে ইচ্ছা হয় না, পূজোর সময়ে এনে যাচ্ছেতাই ভিড়ভাট্টা, স্কুল খুললেই ছেলে-মেয়ের পরীক্ষা। শীতের সময়ে নিরুপমের একটা-না-একটা অসুখ বাধে, কিংবা অলকার বা বুবুনের বা ইলুর। তিন-চার বছরের মধ্যে বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি অলকার।

অলকা একদিন তার বাবার সম্পর্কে কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, দেখে এক সপ্তাহ ধরে ওর মন খারাপ, চিঠি লিখে খবর জেনেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, কেবলই ভয় পেত কিছু না ঘটে যায়। তাই বুবুনদের পরীক্ষা হয়ে যেতেই বললে, দিন পনরো জামসেদপুর থেকে ঘুরে আসি, কি বলো? তুমিও ছুটি নাও না।

এ-সময়ে নিরুপমের ছুটি পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, তার ওপর হোম বোর্ডের একজন ডিরেক্টর আসছে রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। নানা ধরনের ইনফরমেশন

হাতে হাতে জুগিয়ে দিতে হয় নিরুপমদের ডিপার্টমেণ্টকে। অসহায়ের মত নিরুপম তাই বললে, কি করে যাই বলো। বরং পারি তো দু-তিন দিন ছুটি নিয়ে শেষের দিকে যাবো। দেখা করে আসাও হবে ওদের সঙ্গে, তোমাদের নিয়ে আসাও যাবে।

আগেকার দিনে অলকা একা একাই যেতে পারতো, ওর দাদারা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলে ও একাই চলে আসতো। এখন ছেলেটা বড় হয়েছি, ইলুও ছোট নেই, তাই লটবহর বেড়েছে। তাছাড়া আজকাল দূরের পথে যাতায়াতে, বিশেষ করে রাতের ট্রেনে, তেমন নির্ভয় হতে পারে না। কারণ রাস্তাঘাট আজকাল নিরুপদ্রব নেই।

অলকা তাই শেষ অবধি ওর মাকে চিঠি লিখেছিল, মা চিঠি পেয়েই ওর রাঙাদাকে পাঠিয়ে দিলো অলকাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

রাঙাদা বললেন, নিরুপম, তুমিও গেলে পারতে, বাবা-মা দুঃখ করছিলেন, কতদিন তোমাকে দেখেনি।

অলকা একটু রাগত ভাব দেখিয়ে বললে, ওর কথা বাদ দাও রাঙাদা, ও বিলিতী কোম্পানীর বড় অফিসার। তোমাদের মত কি লোহার কারখানা? ওর কি ছুটি নেওয়া চলে, সূর্য-চন্দ্র নিভে যাবে, পৃথিবী ঘুরবে না।

মুখে এ-কথা বললেওবেশ বোঝা যাচ্ছিল অলকা খুব একটা নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছে না, নিরুপমের জন্যে ওর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, বাপের বাড়ি গিয়েও ওর মন ছুটি পাবে না।

অলকার ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ গোছাগাছ করতে যত না সময় লাগলো, তার চেয়ে বেশী সময় লাগলো নিরুপমের জন্যে নিখুঁত এবং পরিপাটি ভাবে সব ব্যবস্থা করতে। বিপিন অবশ্য বহুদিন থেকে আছে, তা প্রায় আট বছর হল, বয়সেও বুড়ো থুত্থুরে, তবু তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না অলকা। সকালে

কখন কি এগিয়ে দিতে হবে, রান্নায় তেলঝাল যেন বেশী না দেয়, ধোপার বাড়িতে কি কি আছে ফর্দ মিলিয়ে ফেরত নেওয়া, বিকেলের খাবার, রাতে মশারি টাঙানো, হাজার রকম নির্দেশ আর উপদেশ। নিরুপমকে ঘরের তালা ওয়ার্ডরোবের চাবি, একটা নতুন টুথপেস্ট আর দাড়ি কামানোর ক্রীম, কোথায় কি আছে সব বারবার বুঝিয়ে দিলো অলকা।

কিন্তু নিরুপমের তখন মনে হচ্ছে সব কেমন ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছে অলকা না থাকলে তার যেন একটা দিনও চলবে না। নিরুপমের এখন ভাবতে ভাল লাগছে যে, ও অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। বুঝতে পারছে এই অভ্যস্ত জীবনের আয়েশটুকুর মধ্যেই অলকার প্রতি ওর ভালবাসা অস্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

ওদের যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লগেলো, ততই নিরুপমের মনের মধ্যে কেমন একটা বিষাদ উঁকি দিতে শুরু করলো। কিন্তু নিরুপম অলকার ঠাট্টা শুনতে হবে এই ভয়ে তার মনের ভাব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো।

অলকার সাবধানের অন্ত নেই। একবার বললে, এই শোনো, যখন বাথরুমে যাবে ঘরে তালা দিয়ে যেয়ো, বিপিনকে অত বিশ্বাস করো না। একবার তোষকের এক প্রান্ত একটুখানি তুলে দেখিয়ে বললে, ওষুধের শিশিটা এইখানে রইলো, রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না। অর্থাৎ স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ওপরই ওর কড়া দৃষ্টি। নিরুপমের যে হঠাৎ এক একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রচণ্ড মাথাধরার ফলে, তখন যেন ওকে শেলফ্ আলমারী ড্রয়ার খুঁজে বেড়াতে না হয়।

বিপিনকে বললে, তোমার হাতেই সংসার ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি বিপিন, তুমি অ্যাদ্দিনের বিশ্বাসী লোক, দাদাবাবুর কাছে

বাজারের টাকা নিয়ে রোজ হিসেব বুঝিয়ে দিয়ো, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেবে, সকালে দেখো দাদাবাবুর যেন কোন অস্থুবিধে না হয়।

অলকার কাণ্ডকারখানা দেখে ওর রাঙাদা হেসেই ফেললেন। বাব্বা, যাচ্ছিস তো টুনু মাত্র দিন পনরোর জন্যে, ছোটমামা বিলেত যাবার সময়ও মা এত উপদেশ দেয় নি।

'তুমি থামো তো', বলে অলকা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। তারপর নিরুপমের সঙ্গে আড়ালে এক চিলতে চোখাচোখি করে হেসেও নিয়েছ।

ওদিকে বুবুন ও ইলু মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দে অধৈর্ব হয়ে উঠছে, সকাল থেকে কেবল হিসেব করছে ট্রেনের আর কতটা সময় বাকি। বছর দুই আগে ওদের ছোটমামী যখন ডাক্তার দেখাতে এসেছিল, সে-সময় দিন তিনেকের জন্যে মামাবাড়ী ঘুরে এসেছে ওরা। অলকার তখন খুব শরীর খারাপ, তা না হলে অলকাও ঘুরে আসতে পারতো।

ট্রেনে উঠে হ্যাফ-প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে বুবুন এমন একটা ভাব করছিল যেন পিছনে কলকাতাটা পড়ে রইলো আগের দিনের খবরের কাগজ হয়ে, আকর্ষণ হারানো জঞ্জাল হয়ে। ইলু তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না, কিন্তু বেশ বোঝা গেল বাবার জন্যে ওর মন কেমন করবে। তা দেখে নিরুপমের একটু কষ্ট হলো, একটু ভালোও লাগলো।

গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে অলকা বললে, সাবধানে থেকো, অস্থখ বাধিয়ে বসো না। কিছু শরীর খারাপ-টারাপ হলেই কিন্তু ট্রাঙ্ক-কলে খবর দিয়ো।

বিনীত ছাত্রের মত সমস্ত কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো নিরুপম, ফ্ল্যাগ নেড়ে নেড়ে গার্ড হুইস্‌ল্‌ বাজালো। আর ট্রেন বেশ কিছুটা সরে যাবার পর উল্টোমুখে হাঁটতে হাঁটতে গেটের

বাইরে এসে পৌঁছেই নিরুপমের কেমন হাল্কা আর ফাঁকা লাগলো। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে রিস্ট ওয়াচটা খুলে ফেলার পর যেমন লাগে। চোখে দেখে মনে হয় খুলে ফেলেছি, কিন্তু কব্জিতে অনুভূতিটা তখন সমানই।

স্টেশনের বাইরে এসে কিউয়ে দাঁড়িয়ে ভিখিরি বাচ্চাদের মত পিছন পিছন খানিকটা ছুটে এসে ট্যাক্সি ধরে রেড রোড ল্যান্সডাউন সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের হু হু হাওয়ায় বাড়ি ফিরলো নিরুপম। রাস্তাঘাট অন্ধকার, সব তখন অশান্ত আলো হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে চারতলা বাড়িটার দিকে তাকাতেই নিরুপম হঠাৎ একা হয়ে গেল। চারতলা বাড়িতে আটখানা ফ্ল্যাট সব আলোয় ঝলমল করছে। শুধু নিরুপমদের তিনতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটের ঘরে আলো নেই, গোলবারান্দাটাও অন্ধকার।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠলো নিরুপম। দুবার বেল বাজতেই তিনতলার ফ্ল্যাটের শূন্যতার দরজা হাট করে খুলে দিল বিপিন। আর তখনই ওদিকের ফ্ল্যাটের অবনীবাবু বোধহয় বেরুচ্ছিলেন সিঁড়িতে এক ধাপ পা ফেলে। দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিহি গলার রসিকতা শোনা গেল, কি নিরুপমবাবু, মিসেস চলে গেলেন আজ? মিসিং দি মিসেস, কি বলেন, অ্যা?

লোকটিকে নিরুপমের একটুও ভাল লাগে না। তাই এক টুকরো ভদ্রতার হাসি দিয়ে ভিতরে ঢুকেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের সামনে চোখে চোখ রেখে ক্যাট ক্যাট করে তাকিয়ে রইলো একরাশ বড় বড় পিতলের তালা। সব ঘরের দরজায় ইয়াববড়ো একটা করে পিতলের তালা।

পকেট থেকে অলকার-দেওয়া চাবির গোছাটা বের করে শোবার ঘরের তালাটা খুললো নিরুপম। খুলতে গিয়ে হাত

থেকে পড়ে গেল শব্দ করে। আর নিরুপমের সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে গেল।

না এ ক'দিন আর-কোন ঘর খুলবে না। বারবার তালা খোলা তালা লাগানো, এসব নিরুপম একদম পারে না। ওদের ঘর আর বুবুনের ঘর একেবারে পাশাপাশি। মাঝখানে একটা দরজা আছে। দু পাশ থেকেই খিল দেওয়া যায়। টুকিটাকি ওর যা কিছু দরকার হতে পারে ও-ঘরে রেখে গেছে অলকা। বারান্দার দিকেও বুবুনের ঘরের একটা দরজা আছে। সেটা না খুললে ঘরখানা একটু অন্ধকার অন্ধকার থাকে।

চুপচাপ একটা মানুষ একা-একা বাড়িতে থাকতে পারে নাকি! বই-টই কোথাও কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্যে মাঝের দরজাটা খুলতে গিয়ে দেখলে ওপাশ থেকে খিল দেওয়া। বিরক্তিতে মন ভরে গেল। বারান্দার দিকের দরজা খুলতে হবে, দরজার তালা!

শেষ অবধি ঘরটা খুলে বুবুনের খাটের ওপর অ্যালবামটা দেখতে পেয়েছিল। হয়তো অ্যালবামটা নিয়ে যাবে ভেবেছিল অলকা, ট্র্যাঙ্কে ধরেনি। কিংবা বুবুন হয়তো মামা-মামীমাদের দাদু দিদিমার ছবি দেখার জন্যে দুপুরে বের করেছিল। তুলে রাখতে ভুলে গেছে।

ওটা দেখতে দেখতে কিন্তু দিব্যি সময় কেটে গেছে নিরুপমের। একবার ঘড়ির দিকে তাকালো, একবার রেডিওটা খুলেই বন্ধ করে দিলো। বুবুনের একসেট ইংরাজী বুক অব নলেজের ছবিওয়ালা বই আছে। নিয়ে এসে পাতা ওল্টাবে কিনা একবার ভাবলো। তারপর বেতের চেয়ারটা গোল বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

আর তখনই বিপিন এসে বললে, দাদাবাবু আপনার ডাক আছে। বলে একখানা খামের চিঠি এগিয়ে দিলো।

বিপিন চিঠিকে ডাক বলে ব'লে প্রথম প্রথম ওরা হাসতো, এখন আর হাসি পায় না।

নিরুপম চিঠিখানা নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখলো, খুলে পড়লো। প্রথমটা ও চমকে উঠেছিল। তারপর কেমন একটু বিচলিত বোধ করলো। অস্ফুটে বলে উঠলো, দ্যাখো কাণ্ড!

॥ দুই ॥

চিঠিখানা পড়ে নিরুপম রীতিমত বিব্রত বোধ করেছিল। এমনিতেই আজকাল কোন আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে হাজির হলে ও বিরক্তি বোধ করে। ওর নিয়মে বাঁধা জীবনের কোথায় যেন কি একটা ছন্দপতন ঘটে যায়, তিক্ততা জমা হয় মনের মধ্যে; তাছাড়া কিছু-না-কিছু বাড়তি খরচ তো আছেই। সাজানো-গোছানো হিসেবের খাতাটা কেমন যেন ওলোটপালট হয়ে যায়, কেউ তো বোঝে না যে অফিসের মিত্তিরসাহেব আর বিপিনের দাদাবাবুর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। অলকা এ সময় থাকলে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যেত। বলতো, আমি জামসেদপুর চললাম, তুমি সামলাও এসব। সামলাতে হয় অবশ্য অনেক কিছু। উপরি ঝঞ্ঝাট, খরচ পত্তর এবং বিপিনকে। ওর কাজ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ। বিপিন তবু টিকে গেছে। আগে যখনই কেউ এসে উঠতো, তারপর দিনকয়েক থেকে চলে যেত, তখন সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোকটাও দু'একদিনের মধ্যে বিদায় নিত। আবার একটা লোক যোগাড় করা যে কি দুঃসাধ্য, নিরুপম জানে।

চিঠিখানা পেয়েই ওর লালচকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তখন বাবা-মা, ওরা ক' ভাইবোন, বেশ বড় সংসার। তবু লোকজন কেউ এলে মা কি খুশীই না হত। বাজার থেকে গোটা রুই মাছ আনতো বাবা, বঁটি নিয়ে মা যখন মাছ কুটতে বসতো,

মা'র মুখচোখ দেখে মনে হত যেন বাড়িতে কারো আশীর্ব্বাদ কিংবা ছেলে পাশ করেছে।

তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ওসব পোষাতো। এ-কথা নিরুপম অনেক সময় ওর বন্ধুদের কাছেও শুনেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়লো, অলকাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফেরার সময় ও বাসে না চড়ে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ধরেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে এরকম এক-আধটা বিলাস না থাকলে জীবনের কোন মানেই থাকে না।

চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে নিরুপম কিন্তু বিব্রত বোধ করছে অন্য কারণে। তা না হলে ওর একটু কৌতূহলই বা হচ্ছে কেন। এক একবার একটু ভালও লাগছে।

প্রথমে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তর দিয়ে ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। একবার ভেবেছিল, একটা টেলিগ্রাম করে দিই। কিন্তু চিঠিখানা উল্টেপাল্টে তারিখ দেখে ভিতরের লাইন ক'টা আরেকবার পড়ে বুঝতে পেরেছিল এখন আর উপায় নেই।

রাত্তিরে বিপিন যখন মশারি টাঙিয়ে দিতে এলো, তখনো ওর মনের ওপর একটা ভারী পাথর, দুশ্চিন্তার শেষ নেই। প্রায় মরীয়া হয়েই তাই অস্ফুটে বলে উঠেছিল,--দুত্তোর যা হয় হবে।

বিপিন, চমকে ফিরে তাকিয়েছিল মশারি টাঙাতে টাঙাতে। হেসে ফেলে বলেছিল, আজ্ঞে বৌদির মতন হল নি ?

নিরুপম কোন উত্তর দেয়নি।

বিপিন সন্ধ্যে থেকেই চেষ্টা করছে দাদাবাবুকে তোয়াজ করার। দাদাবাবু যেন তার কাজে কোন খুঁত ধরতে না পারে। কিন্তু মশারি-টাঙানো কিংবা বিছানার চাদর পাতা কোনই কিছুই যেন ঠিক-ঠিক হচ্ছিল না। খেতে বসেও সব কিছু

বিস্বাদ লেগে ছিল নিরুপমের। সত্যি, অলকা না থাকলে ঘরদোরের চেহারাই যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

নিরুপমের একবার মনে হল, এসব কিছুই না, আসল অতৃপ্তি বোধহয় চিঠিটার জন্যে। রূপা যে কোনদিন ওকে চিঠি লিখতে পাবে, সেটুকুই নিরুপম ভাবতে পারেনি। অনেক-দিন আগে একটা বিয়েবাড়িতে রূপাকে ও দেখেছিল। দেখতে পেয়েই ওর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। আর চোখোচোখি হতেই ঝট করে মাথা নামিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল। খেতে বসার সময়েও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল কাছেপিঠে কোথাও রূপা বসেছে কিনা; ওকে দেখে রূপার ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল কিনা নিরুপম জানতে পারে নি। কিন্তু যতক্ষণ না সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে নিমন্ত্রিতের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পেরেছিল, ততক্ষণ ওর পিঠের শিরদাঁড়া শিরশির করেছে। মনে হয়েছে, রূপা ওর পলাতক ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়ে আছে তাচ্ছিল্যের বা ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে।

এরপর আর দেখা হয়নি। কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের মারফত দু'একটা টুকরো খবর ওর কানে এসেছে। রূপারা যখন কানপুর বদলি হয়ে গেল, তখন সে খবরও কিভাবে যেন এসে পৌঁছেছিল।

সেই রূপা কিনা নিরুপমকে চিঠি লিখেছে, জানিয়েছে ওর বাড়িতে এসে উঠবে, থাকবে দিন কয়েক। লিখেছে উপায় থাকলে তোমাদের বিব্রত করতাম না।

ওর স্বামীর নামটা নিরুপমের মনে পড়ে গেল। হৃষীকেশ।

ওরা কে কে আসছে তা স্পষ্ট করে লেখেনি রূপা। কিন্তু একটা ব্যাপার নিরুপমের কাছে কিছুতেই স্বচ্ছ হল না। জরুরী কোন কাজ থাকতে পারে, হয়তো হৃষীকেশেরই, হয়তো এসে উঠতে পারে এমন আত্মীয় নেই বা আত্মীয়ের বাড়িতে

স্থানাভাব। কিন্তু হোটেল তো ছিল। হঠাৎ কি যেন ভাবলো নিরুপম, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, পরক্ষণেই ও হেসে ফেললে! তাও কি সম্ভব নাকি!

নিরুপম অস্বস্তি বোধ করছিল অন্য কারণে। ওর কেমন ভয়-ভয় করছিল, ও আর কোনদিন বোধহয় রূপার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না। চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপার মুখখানা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা, কেমন এক ধরনের শূন্যতা বোধ করলো। আবার তখনই মনে হল রূপার মুখোমুখি ও দাঁড়াতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না।

শেষে হৃষীকেশের চোখে ধরা না পড়ে যায়। নিরুপম তো চেষ্টা করলেও স্বাভাবিক হতে পারবে না, স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে সারাক্ষণ অভিনয় করতে পারবে না।

রিস্টওয়াচটা টেবিলের ওপর নামানো ছিল, বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলো সাড়ে ছটা বেজে গেছে। ঘড়িতে দম দিয়ে রেখে দিল; দরজা খুলে কলঘরে চোখ মুখ ধুতে যাবার সময় চিৎকার করে বললে, বিপিন, তোমার চা হল না এখনো?

এই প্রথম বোধ হয় ওকে সকালে উঠে চায়ের কথা বলতে হল। অলকা থাকলে ছটার সময়েই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, কলঘর থেকে ফিরে এসে দেখে চা হাজির।

দূর দূর, এভাবে একটা মানুষ থাকতে পারে নাকি। একা থাকা মানে যে এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া, নিরুপম ভাবতেই পারে নি। আসলে বুবুন আর ইলু নেই বলেই হয়তো বাড়িটা রাতারাতি এক টুকরো নিঃশব্দতা হয়ে গেছে!

রূপার চিঠিখানা ওর চোখের সামনে টেবিলের ওপর পড়ে-ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রথম যৌবনের দু' একটা ছোট ছোট ঘটনা বুদ্বুদের মত ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে সেগুলোকে ধরতে যাবার আগেই বিপিন এসে বললে, বাজার যাবো তো দাদাবাবু ?

বাজারের নাম শুনেই নিরুপমের সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো। অলকা নেই, বুবুন নেই, ইলু নেই, কার জন্যে বাজারে যাবে ও ! শুধু একটা মানুষের জন্যে ? শুধু নিজের জন্যে কিছু করতেই ইচ্ছে করে না ওর।

পকেট থেকে ব্যাগ বের করে, ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বিপিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিরুপম বললে, নিয়ে যাও।

—মাছ কত আনবো দাদাবাবু, কি কি হবে ই-বেলা ?

নিরুপম তীব্রস্বরে বলে উঠলো, কিচ্ছু জানি না, যা ইচ্ছে করবে, যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

একটু পরেই হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললে, না বিপিন, সবই একটু বেশী বেশী করে আনতে হবে।

নিরুপম নিজেও বুঝতে পারলো না, ও কেন সবকিছুতে এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আপিস যাওয়ার আগে স্নান করে এসে চিরুনি খুঁজে পেল না নিরুপম, চিৎকার করে উঠলো, এই বিপিন, চিরুনি কোথায় গেল ?

পরক্ষণেই নিজের বোকামি নিজেই বুঝতে পারলো। এ-সব তো বিপিনের জানার কথা নয়, বিপিনের খোঁজ রাখার কথা নয়। প্রত্যেকটা ঘরে তো বড় বড় পিতলের তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে অলকা। তার চাবি নিরুপমের কাছেই।

শুধু একটা খবরই নিরুপম জানতো না, তার ছকে-বাঁধা জীবনের চাবিটা নিয়ে গেছে অলকা। ছকে বাঁধা, ছকে বাঁধা। এই আজ পাঁচ তারিখ, মনে আছে তো ? আজ পার্ক স্ট্রীটে···· সিনেমার টিকিটটা কেটে রেখো, পরশু শনিবার··· কবে কবে

সিনেমা যাবে ওরা, মাসের শুরুতে ভাল রেস্তরাঁয় একদিন চীনে খাবার খাওয়া, ছুটির বিকেলে আউটরাম, সমস্ত আনন্দগুলো যেন ঘর-কাটা রুটিনের মত, সেই বুবুন ওব ইস্কুলের খাতার পিছনে যে-ভাবে লিখে রাখে!

চিরুনিটা শেষ অবধি খুঁজে পেল নিরুপম। যেখানে থাকার কথা সেখানেই ছিল। নিজেই ভুল করে অন্য জায়গায় খুঁজতে গেছে।

আপিসের পোশাক পরে খেতে বসে মনে হল কোনটাতেই স্বাদ নেই। একটা দিনেই ব্যাটা বিপিন যেন গেঁয়ো নভিস হয়ে গেছে। থালাটা ঠেলে দিয়ে বললে, মুখে দেওয়া যায় না, যাচ্ছে তাই।

বিপিন মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাম-স্টপে অপেক্ষা করতে করতে মনে হল, না, বিপিনটার দোষ নেই। বাড়িটা ফাঁকা, ওরই বা কাজে মন বসবে কেন?

হঠাৎ এক সময় ওর মনে হল, আচ্ছা অলকাকে একখানা চিঠি লিখলে কেমন হয়। বেশ মিষ্টি করে একখানা ভালবাসার চিঠি। কত দিন কত বছর কেটে গেছে, অলকাকে কোন চিঠি লেখার সুযোগ পায় নি। একই সঙ্গে এত কাছে কাছে পাশে পাশে সর্বক্ষণ থাকলে চিঠি লেখার সুযোগ পাবে কি করে। কিন্তু খুব কাছের মানুষকে সব কথা বলা যায়, কি যেন বলা হয়ে ওঠে না। চিঠিতেও বোধ হয় সে-কথা ও লিখতে পারবে না, নিজেরই হাসি পাবে। অলকাও হেসে ফেলবে, ফিরে এসে বলবে, তোমার হল কি। জানো, মেজবৌদি চিঠি খুলে পড়েছে, সব্বাইকে দেখিয়েছে, হেসে গড়াগড়ি দিয়েছ ওরা। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অলকার ছোট বোন নীলাও নিশ্চয় ওকে ঠাট্টা করবে। নীলা তো গত বছর সল্ট লেকে একজিবিশন

দেখতে এসেছিল, ভিড়ের মধ্যে নিরুপম একবার পিঠে হাত দিয়ে অলকাকে ভিড় থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিল। আর নীলা এত ফাজিল! সারাক্ষণ হেসেছিল ঐ পিঠে হাত-দেওয়া নিয়ে।

সত্যি, মানুষে মানুষে সম্পর্কটা কি অদ্ভুত! বেশী আপন হয়ে গেলেই আপনা-আপনি একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। সকলের অলক্ষ্যে।

আর রূপা কত দূরের মানুষ হয়ে গেছে, অথচ এখন যেন কত কাছে। শুধু একখানা চিঠি ওকে একেবারে কাছে এনে দিয়েছে।

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। কে যেন বলেছিল। মানুষ যখন অন্ধকারে হাঁটে টর্চের আলোটা ফেলে অনেক দূরে, পা ফেলে সেই অন্ধকারেই। কথাটা হঠাৎ কেন মনে এলো বুঝতে পারলো না। অলকা কিংবা রূপা কিংবা আজকের দিনটার সঙ্গে এ-কথার কোন যোগাযোগ খুঁজে পেল না।

ও স্টেশনে যাবে কিনা, নিরুপম সারাদিন একটা দ্বিধার মধ্যে ছিল। রূপা অবশ্য তেমনভাবে লেখে নি। সে হয়তো জানে নিরুপম ব্যস্ত মানুষ, ছুটিছাটা ইচ্ছে থাকলেও পায় না। আর বড় রাস্তার ওপরেই নিরুপমের বাড়ি, খুঁজে নিতেও নিশ্চয় অসুবিধে হবে না। কিন্তু কোন্ ট্রেনে আসছে, কোন্ সময় পৌঁছবে, রূপা জানাতে ভোলে নি এবং সেজন্যই নিরুপমের মনে হয়েছে রূপা আশা করছে ও স্টেশনে যাবে। যেন চিঠির ও-দুটি লাইনের মাঝখানে অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে, তুমি স্টেশনে এসো কিন্তু। স্টেশনে যেতে প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে ওর, শুধু একটাই অস্বস্তি, চোখ তুলে তাকাতে পারবে কিনা, কথা বলতে পারবে কিনা!

শেষ অবধি আপিস থেকে সোজা স্টেশনে গিয়ে হাজির হল নিরুপম।

ট্রেনে এসে দাঁড়াতেই ভিড় ঠেলে ঠেলে ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে কামড়া থেকে আরেক এক কামরায় উঁকি দিয়ে এগিয়ে চলেছিল ও।

মালপত্র প্লাটফর্মে নামিয়ে রূপা বোধ হয় বিভ্রান্তের মত ভিড়ের মধ্যে থেকে চেনা মুখটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। চকিতে নিরুপমের চোখে চোখ পড়তেই রূপা কৃষ্ণচূড়ার উল্লাস হয়ে গেল।

—নির্পমদা, এই যে এখানে। চিৎকার করে উঠলো রূপা।

মাঝখানে ভিড়, কুলি, ঠেলা-ট্রেলী সব বিলুপ্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। নিরুপম হাত তুলে ইশারা করলো। এত অস্বস্তি, এত দুর্ভাবনা নিমেষে মিলিয়ে গেল।

নিরুপম ততক্ষণে কাছে এগিয়ে গেছে। রূপা হাসি-হাসি মুখে তার পাশের লোকটিকে বললে, এই তো এসে গেছে, কি. বলেছিলাম না? আপনি তো ভেবেছিলেন, আপনার ঘাড়ে পড়বো।

রূপা হেসে উঠে বললে, যান, এবার আপনার ছুটি।

ভদ্রলোক নমস্কার জানালেন, তারপর হেসে বললেন, আপনার জিম্মায় দিয়ে গেলাম। তারপর রূপার দিকে ফিরে বললেন, ঠিক ঠিক লোকের কাছে পৌছে দিয়েছি, মিস্টার বোসকে জানিয়ে দেবেন।

রূপার দিকে ফিরেও আরেকবার নমস্কার করলেন ভদ্রলোক। রূপাও।

কিন্তু নিরুপমের হঠাৎ মনে হল, রূপা যখন তাঁকে নমস্কার করতে গেল দু' হাত জোড় করে, তখন রূপার বাঁ হাতটা····

নিরুপম ভাবলো ওটা ওর মনের ভুল, কিংবা আরেক ধরনের ফ্যাশান।

রতনবাবুর মালপত্র ততক্ষণে কুলির মাথায় উঠেছে। একবার নিরুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলি। একবার রূপার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলি।

কুলির মাথায় রূপার ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ তুলে দিয়ে এতক্ষণে নিরুপম অবাক হবার সুযোগ পেল। বললে, তুমি একা—

দু'টো কাঁধ বাঁকিয়ে রূপা হেসে উঠলো। বললে একা, এক্কেবারে একা।

গেটের দিকে কুলির পিছনে পিছনে যেতে যেতে রূপা এবার বললে, তুমি না এলে বেচারী রতনবাবু কি বিপদেই না পড়তেন। বাড়ি খুঁজে আমাকে পৌছে দিয়ে তবে। ওকে যেতে হবে ব্যারাকপুর।

নিরুপমের কানে এ-সব কোন কথাই যাচ্ছিল না। ও আবার বললে, তুমি একা ? এক্কেবারে একা ?

নিরুপমের মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। গোপন একটা হীনতা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এতকাল ধরে ও হেঁটে বেড়িয়েছে। কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। কারো কাঁধে মাথা রেখে অনুশোচনায় কাঁদতে পারেনি। নিরুপম তো একটা জুয়েল, রূপার বাবা বলতেন। 'নিরুপম এবার অফিসার্স গ্রেড পেয়েছে', নিরুপমের বাবা গর্ব করে কার কাছে যেন বলেছিলেন। মেজদিভাই, তোর বরটা কিন্তু দারুণ হ্যাণ্ডসাম, অলকার মাসতুতো বোন বলেছিল। নিরুপম নিজেও এক একসময় অহংকারে মাথা তুলতে গিয়ে দেখেছে ওর বুকের গভীরে কোথায় ভিতরের মানুষটা হীনতায় মাথা নিচু করে আছে।।

ও ভেবেছিল রূপার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

কিন্তু ও আশ্চর্য হয়ে গেল রূপার সপ্রতিভ ভাবটুকু দেখে। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, সব ঠিকঠাক, তেমনি আগের দিনের মতই আছে।

অনর্গল কথা বলছিল রূপা। হাসছিল। হঠাৎ বলে উঠলো, চিঠি পেয়ে তুমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, তাই না ?

তারপরই আবার একটু বিষণ্ণ সুরে বললে, আশ্চর্য মানুষ তুমি নিরুপমদা, একটা চিঠি লিখেও কোনদিন খোঁজ নিলে না।

রূপার এই সপ্রতিভ ভাবটুকু, ওর গলার স্বরের গাঢ়তা, নিরুপম উপভোগ করছিল। ওর ভাল লাগছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা এক পলকের অস্বস্তি উঁকি দিয়ে গেল। কথাটা বলতে গিয়ে রূপার এই প্রগলভ মুহূর্তটুকু ভেঙে দিতে ইচ্ছে হ'ল না। 'আমি একা, এক্কেবারে একা', কথাটা এতক্ষণে যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে। অলকা, অলকাকে নিয়ে এখন ওর দুশ্চিন্তা। ওর মনে পড়লো, বিয়ের পর প্রথম প্রথম ও যখন অলকাকে নিয়ে বিভোর, একদিন রাত্রে অলকা ওর আদরের মধ্যে ডুবে গিয়েও হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, এই, রূপা কে বল তো! নিরুপম ধীরে বলেছিল, তুমি সঙ্গে জবাব দিতে পারেনি। শেষে ধীরে চমকে উঠেছিল, সঙ্গে চিনবে না, ছোটবেলায় ওর মাকে আমরা বুলাপিসি বলতাম। আরো তো অনেকের নাম ছিল রূপা, কিন্তু তাদের কথা ওর মনে হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল, ওদের দু'জনের, বিশেষ করে অলকার এই সুখী-সুখী ভাবটা ভেঙে দেবার জন্যে নিরুপমের বোন সুধা নিশ্চয় কিছু বলেছে। সেই সব লালচকের দিনগুলোর কথা।

সেদিন সুধার ওপর ও ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলে উঠেছিল। ওর গোপন জ্বালাটাকে হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে। সুধা বোকা, বোকা ও বোধ হয় ভেবে বসে আছে নিরুপম একজন ব্যর্থ প্রেমিক, কিংবা ভাবে নিরুপম রূপার প্রেমের জন্যে এখনো

—তাই বুঝি! নিজের বোকামিতে নিজেই হাসলো রূপা। তারপর বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ভিক্টোরিয়া তো গেটের ভেতরে।

একটা মূর্তি ছিল, মূর্তিটা সরে গেছে। নিরুপম এতদিন ভেবে এসেছে ওর নিজের মূর্তিটি সরে গেছে, কিংবা মূর্তিটা বদলে গেছে। এখন ওর পুরোনো মূর্তিটা ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে করছে। কিন্তু একবার বদলে গেলে সেটা বোধহয় আর ফিরিয়ে আনা যায় না। একটা গোলাপের পাপড়িগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেললে তখন আবার সেই পাপড়িগুলো জুড়ে দিলেই কি সেটা গোলাপ হয়ে উঠবে?

এদিকে রূপার দু'চোখ যেন সবকিছু গ্রাস করতে চাইছিল। প্রকৃতির আলোবাতাস, আকাশ অন্ধকার, গাছের আলোকস্নিগ্ধ ছায়া। একটা আকাশছোঁয়া বাড়ি দেখিয়ে জিগ্যেস করলো, ওটা কি। তারপর নিজেই বলে উঠলো, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

নিরুপম মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল রূপার চঞ্চল ভাবটুকু দেখে। তখনই নুয়ে পড়ে ও ট্যাক্সির এ জানালায় উকি দিচ্ছিল, তখনই শরীরটা টানটান করে ও জানালায় গলা বাড়াতে চাইছিল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঝে মাঝে নিওনের ঠাণ্ডা আলো পড়ছিল ওর মুখে। সব সুন্দর লাগছিল।

ট্যাক্সির হুড়ুমহুড়ুম জার্ক সামলাবার জন্যে সামনের সীটটা একটা হাত বাড়িয়ে ধরে ছিল রূপা, আলো পড়ে ওর ফর্সা হাত, হাতের আঙুল স্বচ্ছ মোমের মত লাগছিল। একটা লোক বোধ হয় আরেকটু হলে চাপা পড়তো, জোর ব্রেক কষলো ট্যাক্সি। আর দু'হাত বাড়িয়ে ধাক্কা সামলাতে গিয়ে রূপা যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো! নিরুপম রূপার দিকে অবাক হয়ে তাকালো, ওর মনে হল রূপা যেন একটা অসহ্য কষ্ট দম বন্ধ করে সহ্য করার চেষ্টা করছে।

নিরুপম বিস্ময়ে চোখ তাকিয়ে জিগ্যেস করলো, কি হল, তোমার কি কিছু হয়েছে ?

অনেকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারলো না রূপা। অনেকক্ষণ পরে হেসে ওঠার চেষ্টা করলো। বললে, বলবো বলবো, এখন শুনলে মিছিমিছি মন খারাপ করবে। বলে বাঁ হাতখানা শাড়ির আঁচলে ঢেকে দিল।

কৌতূহলে কোন একটা আতঙ্কের খবর শুনবে এমন একটা আশঙ্কায় সারা রাস্তা নিরুপম চুপ করে রইলো। কিন্তু রূপা তখন আবার অনর্গল কথা বলছে, অপ্রয়োজনে হাসছে।

বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামতেই ড্রাইভার যখন মীটারের ফ্ল্যাগটা তুলে দিল, একটা টুং করে আওয়াজ হ'ল, রূপা ওর ব্যাগ খুলে বলে উঠলো, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, তখন নিরুপম ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোমাকে অবাক করে দেবার মত একটা খবর আছে। অলকা নেই, অলকা জামশেদপুরে।

এক মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ের চোখে তুলে তাকিয়েছিল রূপা। একটু ম্লান দেখালো যেন ওকে। তারপর বললে, সত্যি বলছো ?

অপরাধীর মত নিরুপম বললে, ওরা চলে যাবার পর তোমার চিঠি এলো।........

রূপা এবার শব্দ করে হেসে উঠলো। বললে, এত কিন্তু কিন্তু করছো কেন, আমি কি বলেছি নাকি তোমার বউয়ের যত্ন-আত্তি না পেলে আমার খুব অসুবিধে হবে। একটু থেমে হাসতে হাসতে বললে, আমার তো ঠিক ছিল, তোমরা কেউ না থাকলে ঐ রতনবাবুর সঙ্গেই চলে যেতাম, ব্যারাকপুর।

রাস্তার ধারে একটা রিকশাওয়ালা বসেছিল, চেনা রিকশা-ওয়ালা, তাকে তখন খোশামোদ করছে নিরুপম। অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালো, সে মাল তুলতে তুলতে গজরালো, আমি

কি মুটে নাকি! সে-কথা শুনে রূপা বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণে কি একটা রসিকতা করলো, লোকটা হেসে ফেললো।

রূপা ততক্ষণে নতুন ডিজাইনের গ্রীল দিয়ে সাজানো চারতলা বাড়িটা দেখছে, খুব অবাক হয়ে। যেতে যেতে বলে উঠলো, বাঃ! খুব সুন্দর বাড়িটা তো তোমার।

নিরুপম হেসে উঠে চাপা গলায় বললে, আরে আস্তে বলো, লোকে শুনে হাসবে। চারতলা এই বাড়িটার আটখানা ফ্ল্যাট, তিনতলার এদিকটা আমাদের।

লোকে শুনে হাসবে! কথাটা খট্ করে লাগলো রূপার কানে। বললে, নির্পমদা, তোমরা কি করে থাকো গো এখানে, দিনরাত প্রেস্টিজ বাঁচিয়ে চলতে হয় মনে হচ্ছে। আমি বাবা তুদিনেই হাঁপিয়ে উঠবো।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, মানুষের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুর মধ্যে থাকায় লজ্জা কিসের আমি তো বুঝি না।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন শজারুর কাঁটা। এক্ষুণি হয়তো সুহাসবাবুর বাড়ির কেউ দেখবে, কিংবা অবনীবাবু মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করবেন। কিংবা কেউ কিছু জিগ্যেস করবে না, কিন্তু সবারই চোখের ভুরু প্রশ্নচিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করবে।

মানুষ নাকি সামাজিক জীব। তার মানে কেন কেন কেন-র উত্তর দাও, তবে মানে রুলটানা রাস্তায় হাঁটো। এই যে অলকা বাপের বাড়ি চলে গেল, এ-সময় হুম করে রূপার একা-একা চলে আসা চলে না। এলেই একটা গুঞ্জন উঠবে।

কিন্তু এসময়ে রূপাকে কেউ ঢুকতে দেখলে বরং ভালই হত। ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ রয়েছে, রূপার কুঁচকে-যাওয়া শাড়িতে ট্রেন-জার্নির ছাপ, শরীরে মলিন ক্লান্তি। সুহাসবাবুর মেয়েদের সঙ্গে, ঝুমার সঙ্গে অলকার খুব বন্ধুত্ব। ফিরে এলে তাকে কি

বলবে কে জানে। মানুষের চরিত্রের এই একটা দিক নিয়ে কারো কৌতূহলের শেষ নেই। কিছু একটা বলে দিলেই হল, চোরকাঁটার মত লেগে থাকবে, তুমি একটু সতর্ক হয়ে ছাড়াতে যাও, দেখবে তোমার অসতর্ক মুহূর্তে অন্যদিকে সেগুলো লেগে গেছে।

বেল্ বাজাতেই বিপিন এসে দরজা খুলে দিল; দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এতদিন এ বাড়িতে কাজ করছে—এমন অদ্ভুত ঘটনা আগে কখনো দেখেনি।

নিরুপমের একবার মনে হল বিপিনকে সকালে জানিয়ে গেলেই হত। পরক্ষণেই ওর রাগ চেপে গেল। যা ভাবে ভাবুক, এমন কি কথা আছে যে ও-ব্যাটাকে সব কথা আগে থেকে জানিয়ে যেতে হবে। রাগটা অলকার ওপরেও। ওর সমস্ত ইচ্ছেগুলো যেন বন্দী হয়ে আছে।

পাশাপাশি তু'খানা ঘর। বুবুনের ঘরের তালা খুলে দিয়ে নিরুপম রেগে গিয়ে বিপিনকে বললে, কি দেখছো কি, ওগুলো নিয়ে এসে রাখো এ-ঘরে।

বলে নিজের ঘরের দরজার তালা খুলতে গেল।

॥ চার ॥

সেদিন দশেরা। দশেরার দিনে লালচকের চেহারা যেন রাতারাতি বদলে যায়। চকবাজারের দু'পাশে রাস্তার ধারে ধারে দোকান পসরা বসতে শুরু করে। থাকে থাকে সাজানো থাকে মিঠাইমণ্ডা। রাংতার মোড়া পেঁড়া, মুগের লাড্ডু, বরফি বালুসাই। কত তার রঙের বাহার, গোলাপী সবুজ হলুদ লাল। সীতারামের মন্দিরের চূড়ায় সেদিন তেকোণা একটা নতুন লাল পতাকা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। হিন্দস্থানী মেয়েপুরুষের ভিড়, মন্দিরের চত্বর থেকে মাঝে মাঝে 'জয় সিয়ারাম, জয় সিয়ারাম' ধ্বনি ভেসে আসছে। কথনো বা 'বজরংবালী কি জয়।'

মন্দিরের সঙ্গে পাঁচিল-ঘেরা একটা কুস্তির আখড়ায় এ ক'দিন দঙ্গল বসেছিল। দশেরার দিন তাদের মেডেল দেওয়া হয়। তারপর সব মরদ আর জেনানার দল শোভাযাত্রা করে রামলীলার ময়দানের দিকে চলতে শুরু করে।

বাঙালীটোলার লোকেরাও রাবণ-পোড়ানো দেখতে চলেছে। অনেকদিন ধরে যারা এখানে আছে, তাদের কথাবার্তায় যেমন, হিন্দী ঢুকে যায় অজান্তেই, তেমনি দঙ্গলের আখড়া ঘিরে দাঁড়িয়ে কুস্তি দেখা কিংবা রাবণবধ দেখতে যাওয়ার তাদেরও সমান উৎসাহ।

রূপা, নিরুপম, নিরুপমের দু'বোন, একজন রূপার সমবয়স্ক সুধা, আরো অনেক ছেলেমেয়ে দলবেঁধে চলেছে সেদিন। ওরা

ভিড়ের মধ্যে যাবে না, লাইনের পার থেকে দাঁড়িয়ে রাবণ-পোড়ানো দেখবে। বয়স্কদের মধ্যেও দু'একজন ছিল।

রামলীলার ময়দানটা বিরাট। একদিকে পরিত্যক্ত কোয়ারেন্টাইন, কেউ বলে যখন প্লেগ হয়েছিল, কেউ বলে বসন্ত মহামারীর সময় সরকার থেকে ওটা করে দিয়েছিল। চারপাশে তার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ভেতরে জঙ্গল, ওটা কোনদিন কোন কাজেই লাগেনি। আরেক দিক খৃস্টানদের কবরখানা, দেবদারু গাছ, সব সময় মার্বেলের মত ঠাণ্ডা। কবরখানার মধ্যে ওরা একদিন বেড়াতে গিয়েছিল।

কবরখানা আর কোয়ারেন্টাইনের সামনে বিরাট একখানা মাঠ। লোকে বলতো, রামলীলাব ময়দান। সেই মাঠে একটা অতিকায় রাবণ বানানো হয়েছে। দৈত্যের মত দশমুণ্ড রাবণ দাঁড়িয়ে আছে যেন মাথাগুলো আকাশে ঠেকবে। পাশাপাশি দশটা মুখ, ইয়া ইয়া গোঁফ, ভাটার মত দশ দু'গুণে কুড়িটা চোখ, হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল।

রূপার তখন কতই বা বয়স, সতরো আঠাবো। না, বোধহয় আরেকটু বেশি। মেয়েদের কলেজ ছিল একটু দূরে, রূপাদের একটা বাঁধা টমটম ছিল, সেই টমটম করে ও কলেজ থেকে ফিরতো। সুধাটা পাশ করতেই পারেনি।

ওরা তখন রেললাইন পার হচ্ছে। পার হয়েই ঢল নেমে গেছে অনেক নিচে। সেখান থেকে বিশাল চেহারার রাবণকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, তার চেয়েও অদ্ভুত লাগছিল মাঠে জড়ো হওয়া মানুষগুলোকে। কারো কারো হাতে লম্বা বাঁশে তেকোণা লাল পতাকা। দূর থেকে, বিশেষ করে ময়দানটা অনেক নিচে নেমে গেছে বলে মানুষগুলোকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল।

রূপা হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠে বলল, নির্পমদা, দ্যাখো দ্যাখো......

ওরা সবাই হাসছিল, শুধু সুধা বলে উঠেছিল, নির্পমদা বলিস কেন রে, নিরুপমদা বলতে পারিস না ?

নিরুপম ওদের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, আর রূপা রাগের ভান করে বলেছিল, আমার যা ইচ্ছে বলবো, নির্পমদা কি তোর একার ?

তারপর একটু দূরে কালো সাহেবের মেয়ে গঙ্গা আর যমুনাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়েছিল রূপা, চিৎকার করে ডেকে বলেছিল, যমুনা, চলে আও ইধর, রাবণসে পাকড়া যাওগী, কিংবা ঐ রকম কিছু একটা। এতকাল পরে নিরুপমের হিন্দী-টিন্দি এখন আর মনে নেই।

শুধু মনে আছে গঙ্গা চোখে চোখে কি যেন বলেছিল রূপাকে, আর যমুনার দিকে ইশারা করে রূপা হেসেছিল। যমুনা মেয়েটা খুব লাজুক ছিল, ও রেগে গিয়ে আর এদিকে তাকায়নি।

আসলে নিরুপম কিছু ভেবে বলেনি, একদিন শুধু গল্প করতে করতে বলেছিল, মারাঠী মেয়েরা দেখতে খুব সুন্দর। এই কথাটা নিয়ে রূপা নিশ্চয় যমুনাকে রাগাতো। নিরুপমের সেজন্যে ওদের হাসি-হাসি ইশারা খারাপ লাগলো।

নিরুপম অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পেরেই রূপা ভালমানুষের মত আরো কাছে এসে দাঁড়ালো নিরুপমের। বললে, ছ্যাখো ছ্যাখো নির্পমদা, গ্যালিভার্স ট্র্যাভেলসের বইয়ের সেই ছবিটার মত। ক্ষুদে মানুষগুলো যেন গ্যালিভারকে ঘিরে আছে।

নিরুপমের নিজেরও ঠিক সেইরকমই মনে হচ্ছিল। মানুষগুলো যেন তুচ্ছ।

সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে আকাশ ফাটিয়ে বজরংবলী মহাবীরজী-র জয়ধ্বনি উঠলো। মনে হল, ওরা সকলেই যেন সমবেতভাবে রাবণ নিধনে অংশ নিতে চাইছে। যেন যত অন্যায়

অবিচার তার প্রতীক ঐ অতিকায় রাবণের মূর্তিটা। ওটাকে বধ করতে পারলেই মুক্তি।

তখন ও আদর্শবাদী সদ্য যুবক। জানতো না প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটা করে রাবণ বাসা বেঁধে আছে। সমাজের চোখে যে রাবণ, তাকে বাণবিদ্ধ করতে পারলেই যেন সব সমস্যার সুরাহা হবে। কিন্তু বুকের মধ্যে যে রাবণ লুকিয়ে থাকে, তাকে যে পোড়ানো যায় না, অনুশোচনার আগুনে শুধু নিজেকেই পুড়তে হয়।

রাত্তিরে খেতে বসে রূপাই কথাটা তুলেছিল। —আচ্ছা. এখনো রাবণ পোড়ানো হয় নির্পমদা? ইস্, এত ইচ্ছে করে না একবার গিয়ে দেখে আসতে। যাবে একবার, সবাই দলবেধে যাবো।

নিরুপম হ্যাঁ না কিছুই উত্তর দেয়নি, কারণ সেদিনের সেই দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা রাবণটাকে ও দেখতে পেয়েছিল। ও চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না।

খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে গল্প করতে করতে এক-একবার খাওয়া বন্ধ করে ফেলেছিল রূপা। নিরুপম ধমক দিল—খাওয়া শেষ করে তো আগে; গল্প করতে গেলে তোমার আর 'আর কিছু মনে থাকে না।

রূপা হেসে উঠলো।—নীল রঙমাখা রামকে মনে আছে? পাকীর ধারে বাতাসা বিক্রি করতো।

সব মনে আছে নিরুপমের। আছে বলেই ওর কোন পরিত্রাণ নেই, কোন মুক্তি নেই।

রূপা সেদিন ওর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, দেখছিল নীল রঙ-মাখা রাম হাতে তীর ধনুক নিয়ে অনেক দূর থেকে বাণ মারবার চেষ্টা করছে।

দেখে ওরা সবাই হেসেছিল। রূপা বলেছিল, রামকে একেবারে লিলিপুটের মত দেখাচ্ছে।

সুধা বলেছিল, ওর হাতের তীর অদ্দূরে যাবে নাকি !

সবাই খুব হাসাহাসি করছিল, আর পাশে দাঁড়ানো একজন ভক্ত গোছের লোক খুব রেগে গিয়েছিল ওদের হাসতে দেখে।

খাবার টেবিলে বসে ওরা কখন দু'জনেই সেই সব স্মৃতিতে ডুবে গিয়েছিল।

নিরুপম খাওয়া থামিয়ে বললে, সত্যি সব যেন এই সেদিনের কথা।

—তীরটা ক'হাত গিয়েই পড়ে গেল, মনে আছে ? বলে হেসে উঠলো রূপা। বললে, কিন্তু রাবণ যখন পুড়তে লাগলো, গ্রাণ্ড লাগছিল, না নির্পমদা।

নিরুপম হেসে ফেললে। আসলে তীরটা কিছুই না, রাবণের অতিকায় মূর্তিটা ছিল কাগজ আর কার্ডবোর্ডে তৈরী। ভিতরে বোমাটোমা রাখা ছিল। কেরোসিন ভেজানো একটা অগ্নিবাণ ছুঁড়ে দিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম করে বোমা ফাটতে আরম্ভ হ'ল। মূর্তিটা দাউদাউ করে আগুনে জ্বলে গেল, সারা আকাশ আগুন। এদিক-ওদিক হাউই ছুটলো, তুবড়ী পড়লো আর আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিল হিন্দুস্থানীরা।

ওদের দু'জনেরই খাওয়া হয়ে গেছে তখন, তবু খাবার টেবিল থেকে উঠতে ইচ্ছে হ'ল না। বসে বসে স্মৃতি মন্থন করতে ভাল লাগছিল।

হঠাৎ কি মনে পড়তে নিরুপম নিজের মনেই হাসলো।

রূপা তাকালো ওর দিকে। বললে, হাসলে যে !

—তুমি কি বলেছিলে জানো, রাবণ পোড়ানো দেখে ফেরার পথে ? বলেছিলে, রাবণকে তোমার খুব ভাল লাগে।

বলেছিলে, হরধনু-ভঙ্গের চেয়ে তরোয়াল উচিয়ে জটায়ু বধ করে সীতাকে নিয়ে যাওয়া........

রূপা শব্দ করে উঠলো। বললে, তখন খুব বোকা ছিলাম, না নির্পমদা। একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি তো চিরকাল বোকাই রয়ে গেলাম।

রূপার কথার মধ্যে আরো কোন অর্থ আছে কিনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো নিরুপম। কথাটা ঈষৎ একটা ধাক্কা দিয়ে গেল ওকে। ওর মনের মধ্যে একটা পাপবোধ আছে। সেটাকে মনে আছে। সেটাকে মনে পড়িয়ে দিল। একটা সুন্দর সম্পর্ককে, মনে পড়িয়ে বা সুন্দর প্রেমকে ও একদিন হত্যা করে ফেলেছিল। তারপর থেকে অন্য স্মৃতিগুলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল, আর সেই পাপবোধ ওকে সারাজীবন তাড়া করে বেরিয়েছে।

এখন সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নিরুপম একসময় হঠাৎ বললে, তোমার হাতে কি কিছু হয়েছে? খুলে বললে না এখানো।

সঙ্গে সঙ্গে রূপার স্মৃতিতে উজ্জ্বল মুখখানা বিষণ্ণ দেখালো।

॥ পাঁচ ॥

নিরুপমের অ্যালবামে রূপার কোন ছবি নেই। অ্যালবামে নিরুপমের নিজেরই কোন ছবি নেই। যেগুলো আছে, তার কোনটার মধ্যেই তো আমি নেই, নিরুপম ভাবলো। অলকা কি জানে, এক এক সময় নিরুপম ঋষির মত পবিত্র হয়ে উঠতে চায়। আবার কখনো কখনো ওর ভেতরটা জন্তু, জন্তুর মত হয়ে যায়। আপিসের পোশাকে ও একরকম, বাড়িতে ডেকচেয়ারে শুয়ে অন্য মানুষ। এ-সব কেউ বুঝতে পারে না, অলকা তো আরো বুঝতে পারে না।

অলকার কথা মনে পড়তেই অস্বস্তি বোধ করলো নিরুপম। রূপা আসার পর থেকে নিরুপম যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠতে চাইছে। হারানো রঙগুলো আবার যেন ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু বুকের মধ্যে খিচখিচ। এই যে রূপা হঠাৎ এসে পড়েছে একা একা, অলকাকে একটা চিঠি লিখে জানানো দরকার। কে জানে, সুধার কাছ থেকে শোনার পর থেকে, ভিতরে ভিতরে রূপা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পুষে রেখেছে কিনা। কিন্তু তার চেয়ে বড় সংকোচ সামনের ফ্লাটের অবনীবাবুকে, সুহাসবাবুর বাড়ির মেয়েদের। ওরা কেউ কিছু ভেবে বসবে কিনা নিরুপম বুঝতে পারবে না।

আসলে ওর সবচেয়ে বড় ভয়, অভ্যস্ত জীবনের নিয়ম থেকে ও বেরিয়ে আসছে। অলকা ফিরে আসার পর কথায় কথায়

বিপিন হয়তো বলে বসবে, দাদাবাবু খেতে বসে রাত বারোটা অবধি গল্প করতো। অলকার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে, তুমি তো বাড়িতে কারো অসুখ হলেও দশটার পর জেগে থাকতে পারো না।

ঝুমাদের কিংবা অবনীবাবুকে কিছু একটা বলা দরকার। ওদের তো কৌতূহলের শেষ নেই। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও যে নিরুপমের বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধছে তার কারণ, ওর নিজের মনের মধ্যে যে একটা পাপবোধ রয়ে গেছে। এইতো সামনা-সামনি বসে এত হেসেছে, গল্প করেছে রূপার সঙ্গে, কিন্তু মাঝে মাঝেই ওর মনে হয়েছে, ওরা দু'জনেই যেন ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছে। ভুলে যেতে পারলে বেঁচে যেত নিরুপম। সুন্দর সম্পর্কটা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো।

নিরুপম ভেবেছিল, ট্রেন জার্নির ক্লান্তি, তার ওপর অনেক রাত অবধি গল্প করেছে রূপা, ও নিশ্চয় অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠবে।

বিছানা থেকে উঠে কলঘরে যাবার সময় দেখলো, বারান্দার দিকের বুবুনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়লো জানালার পাটিতে চুপ করে বসে আছে রূপা, বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সাদার ওপর কমলা রঙের ডুরে শাড়ি পরেছে। এলো চুল ছড়িয়ে নেমেছে পিঠ বেয়ে। বেশ বোঝা গেল রূপা স্নান করে নিয়েছে এই সকালেই। খুব স্নিগ্ধ আর সুন্দর লাগছিল তাকে।

পায়ের শব্দে এক পলকের জন্যে ফিরে তাকালো, একটা চাপা খুশির অঙ্কুর রূপার ঠোঁটের কোণায় চোখের কোণায় উঁকি দিয়েই ম্লান হয়ে গেল।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও আবার উদার দৃষ্টি মেলে তন্ময়তার মধ্যে ডুবে গেল।

এমনি একটা উদাস বিষণ্ণতা মাঝে মাঝেই ওকে পেয়ে বসে। কখনো কখনো একটা আতঙ্ক। সে-সময় ওর কান্না পায়।

একটু আগেই রূপা ওর বাঁ-হাতটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। যখনই একা থাকে, মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু এই দুর্বোধ্য রোগটা, ওকে ক্রমেই আতঙ্কিত করে তুলছে। কবে কোথায় যেন কব্জিতে একটা ছোট্ট আঘাত লেগেছিল। ক্রমশঃ একদিন বুঝতে পারলো ওর আঙুলগুলো অবশ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার প্রথম বলেছিল, বোন টিবি। একটু একটু করে কব্জির ওপর উঠলো যন্ত্রণা, কনুই অবধি। এক এক সময় সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! তখন ওর মনে হয়েছে একটু একটু করে সমস্ত হাতখানাই অবশ হয়ে যাবে। তারপর হয়তো সমস্ত শরীর। ছোটবেলায় একজন প্যারালিসিসের রুগীকে দেখেছিল রূপা। একদিন স্বপ্ন দেখেছিল, ওর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে প্যারালিসিসে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল ও। হৃষীকেশের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সে চিৎকারে, সব শুনে, হেসে বলেছিল, তোমার যত পাগলামি। শুনে সেদিন ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কেন জানি মনে হয়েছিল নির্পমদা ওর রোগটাকে এভাবে অবহেলা করতো না।

চোখ মুখ ধুয়ে এসে নিরুপম তখন জানালার ধারে পাশটিতে দাঁড়িয়েছে।

রুপা কোন কথা বললো না।

নিরুপমের লোভ হচ্ছিল রূপার পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়া হাল্কা চুলের ঢেউয়ে হাত ছোঁয়াতে। কিন্তু পারলো না, কি জানি রূপা কি ভেবে বসবে।

রূপা জানালার পাটিতে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলো, একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকালো। ধীরে ধীরে

বললে, আজকের এই ভোরবেলাটা খুব সুন্দর লাগছে।

একটু থেমে বললে, ঠিক এমনি ভোরে আমরা একবার শিউলি ফুল কুড়োতে গিয়েছিলুম সরস্বতী পূজোর সময়।....সেই সব দিনগুলোই ভাল ছিল।

নিরুপম চুপ করে রইলো। আর রূপা হঠাৎ বিষণ্ণ গলায় বললে, জানো নির্পমদা, এর পর বাঁ হাতে আমি হয়তো একটা ফুলের সাজিও ধরতে পারবো না।

ওর গলার স্বরে কেমন একটা করুণ সুরের রেশ বাজলো। নিরুপম অনুভব করলো সেই মুহূর্তে ও যেন রূপার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। দুটি মন যেন আবার সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে বসেছে পাশাপাশি। রূপা, আমরা দুজনেই জানি এই মনে পড়ে মনে পড়ে খেলার মধ্যে আমরা দুজনেই বলতে চাইছি, ভুলে গেছি ভুলে গেছি। আমি দুহাতে অনুশোচনার অর্ঘ নিয়ে এসেছি, তোমার দু চোখে স্বর্গীয় ক্ষমা। রূপা, সেই পাপবোধ আমাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। রূপা, তুমি আরেকবার আমাকে সুযোগ দাও, আমি প্রেমের মত পবিত্র হয়ে উঠবো।

নিরুপম ভাবলো, আমাদের সমস্ত জীবনটা হয়তো এইরকম একটা প্রার্থনা। আমরা কেবলই নতুন করে শুরু করতে চাই। জীবনের বাঁকে বাঁকে আমিতো কত ছোট ছোট অপরাধ করে গেছি, কত অন্যায় নীচতা। কিন্তু তার একটাও তুচ্ছ হয়ে যায় নি, ভুলতে পারিনি, আজো তারা তাড়া করে বেড়ায়। ওর তো এক এক সময় মনে হয়েছে নিশীথ আর ব্রিজলালের সঙ্গে আবার যদি দেখা হত, ও তাদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে নিত। অফিসের স্টেনো মেয়েটি, কিংবা যাকে ডিঙিয়ে ও প্রোমোশন পেল, পেয়েও দেখলো পাওয়ার মত কিছু নয়, সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জীবনটাকে যদি আবার নির্ভুলভাবে গড়ে নিতে

পারত। রূপা, রূপা, আমি জানতাম না তুমি আমাকে আবার সেই সুযোগ দেবে।

এই সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিরুপম একেবারে অন্য একটা নিষ্পাপ জগতে চলে গিয়েছিল, রূপার কথায় ওর চমক ভাঙলো। গাঢ় শান্ত গলায় রূপা বললে, ভাগ্যিস রোগটা বাধিয়ে বসেছি নির্পমদা, তা না হলে তোমার সঙ্গে দেখাই হত না।

নিরুপম কোন জবাব দিতে পারলো না, রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন ওর মনে হচ্ছে, মাঝখানে যে বয়সগুলো চলে গেছে, সেগুলো যেন অপ্রাসঙ্গিক একটা অধ্যায়ের মত। একজন হৃদয়ের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা গড়ে নেয়, অনেক বছর বাদেও দেখা হলে মনে হয় এই তো উঠে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে, আবার ফিরে এসে কথা শুরু করেছে। রূপাকে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

নিরুপম হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি তোমার হাতখানা।

রূপা হেসে উঠলো, তুমি কি হাত দেখাও শিখেছো নাকি? ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ বলতে পারো?

নিরুপম দার্শনিকের মত বললে, আমাদের কারো কোন ভবিষ্যৎ নেই।

আসলে ও বলতে চাইলো, আমাদের শুধু অতীতের জন্যে অনুশোচনা।

রূপা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে, ওর অসুখের কথা জানতে চাইছে নিরুপম। ও থমথমে গলায় বললে, ওখানে কতবার এক্স-রে করলাম, কত ডাক্তার দেখালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বোন টি. বি., একজন বললে ক্যান্সার হতে পারে। অসুখ অসুখ শুনে আমার নিজেরই এখন নিজেকে ঘেন্না করে। চিঠি লিখে ব্যবস্থা করলাম। স্পেশালিস্ট দেখাবো, ডাক্তার সেন চিঠি

দিলেন, সব ঠিকঠাক, কিন্তু ওর নাকি এখন অনেক কাজ। রেগে গিয়ে বললাম, রতনবাবুর সঙ্গে আমি একাই যাবো। কেউ না থাক, নির্পমদা আছে।

বলে নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে ও হাসলো।

তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ও মা, তোমার এখনো চা খাওয়া হয়নি।

নিরুপম বাধা দিয়ে বললে, আরে না না, বিপিন আছে।

রূপা যেতে যেতে হাসিমুখে ফিরে দাঁড়ালো। বললে, তখন সময় নেই অসময় নেই, চা খেতে চেয়ে কত জ্বালিয়েছো, এখন নয় আমিই একটু জ্বালালাম।

রূপা চলে গেল, আর নিরুপমের মনে হল, বয়স সবচেয়ে বড় ক্ষমা। তখন, তখন, তখন। কিন্তু সেই একটা ঘটনার কথা ওরা কেউই তুলছে না। ভান করছে, যেন ভুলে গেছে।

ঠিক তখনই দরজায় বেল বাজলো। সচকিত হয়ে উঠলো নিরুপম। এ সময়ে কারো আসার কথা নয়। তবু ওর কেমন যেন ভয়-ভয় করলো। অলকা নেই, অথচ....কোন আত্মীয়স্বজন এসে পড়লে ওর আর দুর্নামের শেষ থাকবে না।

না, অবনীবাবু। সামনের ফ্ল্যাটের অবনীবাবু। বললেন, বিপিন আছে? গোটা কয়েক দেশলাইয়ের কাঠি চাই, দেশলাই ফুরিয়ে গেছে। কি ঝঞ্ঝাট বলুন, তিনতলা থেকে নেমে এতখানি হাঁটতে হবে, এই সব ফ্যাসানের পাড়ায় মশাই আমার একদম পোষায় না। অবনীবাবু কথা বাড়াবার চেষ্টা করলেন।

নিরুপম বিরক্ত হল, কিন্তু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থেকেই বিপিনকে দেশলাইটা দিয়ে যেতে বললে। ও সরে এলেই অবনীবাবু পিছন পিছন ঢুকে পড়তে পারেন। রূপা হয়তো চায়ের পেয়ালা নিয়ে সামনে পড়ে যাবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে ফ্ল্যাটে ফিসফাস। ছি ছি, বউকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে

দিয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে........অলকা সব শুনে হয়তো ঠোঁট উল্টে বলবে, তোমার সেই বুলাপিসি না কি বলতে যেন, তার মেয়ে। যেন মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো সব ওদের জানা হয়ে গেছে। যেন রূপার মুখের ওপর বলা যায়, না না, এ বাড়িতে তোমার থাকা চলবে না।

বিপিন দেশলাই দিয়ে যেতেই অবনীবাবু চলে গেলেন। আর নিরুপম ভাবলে, এ সময়ে একটা লোককে বলা যায় না, ও মশাই শুনুন, আমরা যখন লালচকে থাকতাম, শাখায়-প্রশাখায় ওদের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তাও আছে, ওর একটা কঠিন রোগ হয়েছে, ডাক্তার দেখাবার জন্যে।

দরজা বন্ধ করার একটু পরেই চায়ের পেয়ালা হাতে রূপা এলো। জিগ্যেস করলে, কে এসেছিল? শুনে হেসে ফেলে বললে, আমি কে জিজ্ঞেস করেনি ? কি বললে তুমি ?

নিরূপম বললে, ওরা এখনো কেউ জানেই না তুমি এসেছ।

রূপা শব্দ করে হেসে উঠলো। —এই! তুমি কি আমাকে লুকিয়ে রেখেছো নাকি ?

কথাগুলো ওর কাছে রহস্যের মত লাগলো। তারপরই মনে হল রূপা বোধ হয় জানতে চাইছে, ওদের মধ্যে সেই সুন্দর সম্পর্কটা আছে কিনা, কিংবা নিরুপমের মধ্যে সেই নিষ্পাপ মানুষটা।

।। ছয় ।।

রূপাদের বাড়ি থেকে খানিকটা গিয়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, পাঁচিলের ইঁট খসে খসে পড়ছে, তার ফাঁকে শ্যাওলা জমছে, অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে, নতুন পাতা চিক-চিক করছে রোদ্দুরে। আবার এক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে রাস্তা করে নিয়েছে ওপারে খালাসিখোলির লোকেরা, সেখান দিয়ে সবাই যাতায়াত করে। এই মাঠের আগে হয়তো কোন নাম ছিল, তবু হিন্দুস্থানীরা বলতো কবুতরবাগ।

সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো বড় নালাটা লাফিয়ে পার হলেই কবুতরবাগের বাগান। কিন্তু বাগান বলতে তখন আর বিশেষ কিছুই ছিল না। কয়েকটা গাছ এখানে সেখানে, আর ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা উড়তো, উড়ে এসে বসতো পাঁচিলে, মিশিরজীর মন্দিরে, রূপাদের বাড়িতেও। সেজন্যেই হয়তো নাম হয়েছিল কবুতরবাগ। খুব উঁচু একটা বাঁশ পুঁতে দিয়েছিলেন মিশিরজী। বাঁশের মাথায় বাতা দিয়ে তৈরী পায়রা বসার খুপরি। ওটাকে কি বলে নিরুপম জানতো না।

কবুতরবাগের সর্টকাট রাস্তা ধরে হাসপাতাল যাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নিরুপম। নরম রোদ্দুরে ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল, তাদের সাদা আর রঙিন পালকগুলো আলোয় ছায়ায় পলকে পলকে রঙ পাল্টাচ্ছিল, উড়তে উড়তে নেমে এসে পাঁচিলে বসছিল, বাঁশের ডগার ঐ চৌখুপিতে।

ওটাকে কি বলে নিরুপম জানতো না।

হাতে টিফিন কেরিয়ার, পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে লাফ দিয়ে ওপারে যাবার সময় রূপা হেসে উঠেছিল প্রশ্ন শুনে। বলেছিল, এই নাকি জুয়েল ছেলে, তুমি তো কিছুই জানো না, ওটাকে ব্যোম বলে।

নিরুপমের খুব ভাল লাগছিল, ও দাঁড়িয়ে পড়ে একটুক্ষণ পায়রাদের খেলা দেখলো। ঝকঝকে ঠাণ্ডা রোদ্দুরে নানা রঙের পালক মেলে পায়রার দল উড়ছিল, ঘুরছিল, নেমে এসে বসছিল।

রূপা তাড়া দিয়ে বললে, এই, খাবার দিয়ে আসার সময় পার হয়ে যাবে, চলো চলো, মা বসে আছে।

রূপার মা তখন দিনকয়েকের জন্যে হাসপাতালে ছিলেন, অসুখটা কি নিরুপমের ঠিক মনে নেই। রূপা টিফিন কেরিয়ারে রোগীর পথ্য নিয়ে যেত, রূপার মা হাসপতালের খাবার খেতে পারতেন না।

হাসপাতালের যেতে হ'ত খালাসিখোলির ভিতর দিয়ে, রেলের ইয়ার্ড পার হয়ে, তাই রূপার বাবা বলেছিলেন, তাঁর আপিসের পিওন গিয়ে খাবার দিয়ে আসবে।

রূপা রাজি হয় নি। ও নিজে বসে থেকে মাকে না খাইয়ে এলে তৃপ্তি হত না। বাবা মাকে রূপা ভীষণ ভালবাসতো। মা ছিল ওর বন্ধুর মত। মাকে কোন কথা না বলে থাকতে পারতো না।

তাই রূপার বাবা বলেছিলেন, ও রাস্তায় একা যাসনে, বরং নিরুপমের তো এখন কলেজের ছুটি....

কবুতরবাগানের পাশ ঘেঁষে ছিল ধান-চালের গো-ডাউন, ওয়াগন থেকে নামিয়ে রাখা হত ওখানে, তারপর লরী করে, ঠেলায় করে চালান হয়ে যেত চকবাজারে। মাল নামানো-

ওঠানোর সময় যে-সব শস্যকণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো, তারই লোভে পায়রার ঝাঁক উড়ে আসতো, খুঁটে খুঁটে দানা খেত তারা, উড়ে গিয়ে বসতো কবুতরবাগে।

কবুতরবাগের জং-ধরা লোহার ফটকের হু'পাশে হু'খানা শ্যাওলা-ধরা ঘর ছিল। একখানা ঘরে মহাবীরজীর মূর্তি বসিয়ে পূজো-আর্চা করতেন মিশিরজী। পাথরের হনুমান মূর্তিটায় তেল সিঁদুর লেপে লেপে টকটকে লাল হয়ে থাকতো তার সর্বাঙ্গ। চকবাজার থেকে হিন্দুস্থানী মেয়েরা ভিড় করে এসে পূজো দিয়ে যেত। মিশিরজীর মেয়ে ছিল রূপার সমবয়সী, সে ধূপধুনো জ্বালাতে জ্বালাতে রূপাকে দেখতে পেলেই উঠে এসে চিৎকার করে ডাকতো, সহেলী !

সহেলী মানে সই। ওরা হু'জনে খুব বন্ধু ছিল। ও ডেকে জিজ্ঞেস করতো মাতাজী কেমন আছে, কবে ফিরবে হাসপাতাল থেকে। বলতো, মাতাজীর জন্যে আমি পূজা চড়িয়েছি, দেখো, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবেন।

হাতের টিপিন কেরিয়ার দেখিয়ে রূপা বলতো, এখন সময় নেই সহেলী, দেরি হয়ে যাবে। ভাল হিন্দী জানতো, ওদের মেয়েদের কলেজে সবাই হিন্দী বলতো।

সহেলীর কথা শুনতে শুনতে রূপা নিজেই একদিন বললে, মিশিরজীর মন্দিরে মার জন্যে পূজো দেবো, চকবাজারে গিয়ে ফুলবাতাসা কিনতে হবে, যাবে নির্পমদা।

নিরুপম হেসে ফেলে বলেছিল, হিন্দুস্থানী মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে তুমি হিন্দুস্থানী হয়ে যাচ্ছো। হনুমানকে আবার কি পূজো করবে ?

রূপা রেগে গিয়েছিল।—ঠাকুর ঠাকুর, তার আবার বাঙালী হিন্দুস্থানী কি ! তারপর হেসে উঠে বলেছিল, গঙ্গা যমুনা কি হিন্দুস্থানী, ওরা তো মারাঠী। বলো তো ওদের সঙ্গে আর

মিশবো না।—বলে কেমন যেন হেসেছিল।

নিরুপম বুঝতে পেরেছিল রূপা ওকে রাগাতে চাইছে। যমুনা সম্পর্কে ওর কোন দুর্বলতাই ছিল না। কোনদিন তার কথা ভাবেও নি।

—না যাবে না যাবে, আমি একাই যেতে পারবো। রূপা কপট অভিমানে বলেছিল।

নিরুপম বুঝতে পেরেছিল, ওর মার অসুখের সময় ঠাকুর নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি। ও যেতে রাজী হয়েছিল।

দু'জনে চকবাজার ঘুরে ঘুরে ফুল-বাতাসা মিষ্টি কিনেছিল। তারপর মিশিরজীর মন্দিরে এসে ফুল-বাতাসার চাঙারী নামিয়ে খুব ভক্তিভরে রূপা হনুমানজীর মূর্তিটাকে প্রণাম করেছিল। দেখাদেখি নিরুপমের মনে হয়েছিল তারও প্রণাম করা উচিত।

প্রণাম করে উঠতেই মিশিরজী রূপাকে বলেছিলেন, আও বেটি।

নিরুপমকেও বলেছিলেন, আও বেটা।

ফর্সা ধবধবে লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান। চেহারা ছিল মিশিরজীর, গলায় পৈতে, মোম দিয়ে মাজতেন মাঝে-মাঝে। দেখলে, সত্যি সত্যি ভক্তি হত। মধ্যমা আঙুলে হনুমানজীর পায়ের সিঁদুর তুলে নিয়ে মিশিরজী বললেন, আও বেটা, আও বেটি। তারপর একবার রূপার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন, একবার নিরুপমের কপালে।

রূপাকে সেদিন অন্যরকম লাগছিল। সাজলে ও তো বিন্দির টিপ পরতো শাড়ির রঙ মিলিয়ে। সেদিন ওর মার লালপাড় গরদের শাড়ি পরেছিল। ওর ফর্সা কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটায় ওকে উজ্জ্বল পবিত্র একটা ঘৃত-প্রদীপের শিখার মত লাগছিল।

কথা বলার অছিলায় নিরুপম বার বার ওর দিকে ফিরে

ফিরে তাকাচ্ছিল। আর বার বার ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল মিশিরজীর কথা—আও বেটা ও আও বেটি।

ডাক্তার সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেদিনকার দৃশ্যগুলো নিরুপমের চোখের সামনে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ ডাক্তার সেনের সঙ্গে মিশিরজীর চেহারায় কোথায় যেন একটা মিল আছে। তেমনি সৌম্যদর্শন, শান্ত, স্থির। প্রথমে তিনিও একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রূপার কবজিতে, আঙুলের গিঁটে গিঁটে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলেন, এক্স-রে রিপোর্ট দেখলেন, তারপর একটু একটু করে তাঁর মুখে হাসি ফুটলো।

প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, কিছু ভয় নেই মা, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। সময় লাগবে, কিন্তু সেরে যাবে।

বললেন, ও একটা নার্ভের অসুখ, অনেক আগেই আসতে হত।

তারপর ওদের বিদায় জানাবার সময় চেম্বারের দরজা পর্যন্ত উঠে এসে নিরুপমের কাঁধে হাত রেখে বললেন, ইয়ং ম্যান, ভাবনার কিচ্ছু নেই।

সে সময় নিরুপম লক্ষ্য করেছে রূপার মুখ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েই এক ঝলক উল্লাসে ঢাকা পড়ে গেল।

বেরিয়ে এসেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত রূপার ঠোঁটের কোণে একটা চাপা কৌতুকের হাসি দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তার সেন বোধ হয় ওকে রূপার স্বামী ভেবে নিয়েছেন।

রূপার চাপা হাসিটা দেখে, কিংবা ডাক্তার সেনের কাঁধে হাত রাখা সান্ত্বনা শুনে ওর সেই মিশিরজীর কথা মনে পড়ে

গেল। আও বেটি, আও বেটা। সে-সময় মিশিরজীর মেয়ে, রূপার সহেলী, সেও ঠোঁট চেপে ফিক্ ফিক্ করে হেসেছিল।

ও বোধহয় স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

রূপা নিজের মনেই বললে, আবার এক সপ্তাহ পর আসতে বললেন।

নিরুপম হাসলো।—তুমি কি তাড়াতাড়ি পালাতে চাও নাকি।

ঠিক তখনই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে নিরুপম চিৎকার করলো, ট্যাক্সি-সি!

সেটা দাঁড়িলো না, হুস্ করে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে রূপা বললে, আমি এখন ঐ খাঁচায় ফিরবো না। একটু থেমে বললে, ঐ খাঁচার মধ্যে কি করে থাকো গো নির্পমদা!

নিরুপমের মনে হ'ল সত্যি, এতদিন ও একটা খাঁচার মধ্যেই কাটিয়ে এসেছে। অথচ কোনদিন বুঝতে পারে নি। রূপা এসে সেই খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে। এমন একটা খুশির দরজা যার স্বাদ ও অনেককাল পায় নি।

রূপা বললে, আমি এখন হাঁটবো। যতক্ষণ খুশি। তারপর ডাক্তারের কথা টেনে এনে বললে, তুমি তো ইয়ং ম্যান, তোমার এত হাঁটতে ভয় কিসের?—বলে শব্দ করে হেসে উঠলো।

নিরুপম বুঝতে পারলো, ওর রোগ সেরে যাবে এই আশা পেয়ে রূপা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছে।

ফুটপাত ধরে ওরা হাঁটতে শুরু করলো। এলোমেলো বাতাস আসছিল, কখনো টাটকা বাতাস, কখনো পেট্রোলের গন্ধ-মাখা।

কতদিন কতদিন, ও রূপার পাশে পাশে হাঁটেনি। হাঁটতে হাঁটতে এক একবার রূপার হাতে হাত ঠেকেছিল। এক

একবার ইচ্ছে হচ্ছিল রূপার হাতখানা ছুঁতে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে পাশাপাশি হেঁটে যেতে। ভালবাসায় ডুবে যাওয়া একজোড়া যুবক-যুবতীকে একটু আগে সেভাবে হাঁটতে দেখেছে ওরা দু'জনেই; এমনই পরস্পরে মুগ্ধ হয়ে হাঁটছিল যেন ফুটপাথের ভিড় কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে গেছে, কোলাহল নিশ্চুপ হয়ে গেছে, আর ওরা দুজনেই একটা মহাশূন্য রচনা করে নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য করে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে রূপা মৃদু হাসলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল, ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা উড়ছে-ঠাণ্ডা রোদ্দুরে, তাদের পাখাগুলো রোদ্দুরে লেগে ঝিকমিক করছে, তাদের পাখনায় রুপোর পালক, পায়রার ঝাঁক সারা আকাশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

॥ সাত ॥

এই খাঁচার মধ্যে তুমি কি করে থাকো গো নির্পমদা। প্রথম যখন শুনেছিল, আহত বোধ করেছিলো নিরুপম। এখন বুঝতে পারছে, এই ফ্ল্যাট বাড়িটার কথা বলতে চায়নি রূপা। আসলে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যত বড় বাড়িই হোক্, যত খোলামেলাই হোক, শেষ অবাধ সেই একটা খাঁচার মধ্যেই চলে ফিরে বেড়াতে হয়।

ওর অসুখ সেরে যাবে—কথাটা বিশ্বাস করে ফেলেছে রূপা। তাই ওর মুখচোখে একটা আনন্দের উদ্ভাস। সকালে উঠে ওকে দেখে অন্য মানুষ মনে হল।

নিরুপমের খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রূপার সঙ্গে টুকরো টুকরো দু' একটা কথা বলছিল। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে পা গুটিয়ে বসেছিল রূপা। দু'একবার চোখ তুলে তাকালো নিরুপম, রূপাকে দেখলো। বড় সুন্দর লাগছে রূপাকে। এই রূপা যেন বয়সে আর অভিজ্ঞতায় আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

রূপা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ খবরের কাগজটায় টান দিল।—এই, শোন না।

চোখ তুলে তাকালো নিরুপম।

—একটা কথা রাখবে? আব্দারের ভঙ্গিতে রূপা বললে।

নিরুপমের মনে হ'ল রূপা যেন পুরানো দিনের মত হঠাৎ হঠাৎ ছেলেমানুষ হতে চাইছে। ও তাই মৃদু হেসে বললে,

কি বলো ?

ধীরে ধীরে বললে, আজকে অপিসে যেও না নির্পমদা। সারাদিন বসে বসে গল্প করবো। একটা দিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ও স্নান করে নিলো। কিন্তু মুখে বললে, না না, আজ আমার অনেক কাজ, রূপা।

রূপা অনুযোগের স্বরে বললে, তোমার ইচ্ছে নেই, আমি জানি। কাজ, কাজ, তোমার হঠাৎ একদিন শরীর খারাপ হতে পারতো না, মানুষের তো কত কি ঝামেলা হয়, অপিস যেতে পারে না। তখন কি করে ?

নিরুপম কোন উত্তর দিল না। ও যে খাঁচায় বন্দী। এমনিতেই পাড়াপড়শীরা কি ভাবছে কে জানে। কারণ অলকা নেই। ও এখন নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে ফিরতে পারবে না অপিস থেকে, একদিন ছুটি নিতে পারবে না। কারণ রূপা নামের একটি মেয়ে বাড়িতে একা আছে, এক্কেবারে একা। যেন নিরুপমের প্রতিটি রোমকূপে শুধু একটাই বাসনা থাকতে পারে অথচ কেউ জানে না, রূপার কাছে ও এখন নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিতে চায়। একটি নিহত সম্পর্ককে ও আবার পবিত্র করে তুলতে চায়।

সেই ছোট্ট শহরে রূপাদের বাড়িটা তখন ওকে নেশার মত টানতো। রূপার মা খুব স্নেহ করতেন ওকে। রূপার বাবা যেদিন ওর সামনেই বললেন, নিরুপম একটা জুয়েল ছেলে, তারপর থেকে রূপা ওকে ঠাট্টা করে 'জুয়েল' বলে ডাকতো মাঝে মাঝে।

একদিন নিশীথ আর ও সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল, রূপা টাঙায় চড়ে কলেজ যাওয়া পথে নিরুপমকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকলো 'জুয়েল' বলে। রূপা হয়ত নিশীথকে

দেখতে পায় নি। কিংবা দেখলেও লালচকের কাউকে ও পরোয়া করতো না। কিন্তু নিরুপম খুব লজ্জা পেয়েছিল।

রূপার মা যত রাগ করতেন, ধমক দিতেন, রূপা ততই হাসতো। বলতো, বা রে, জুয়েলকে জুয়েল বলবো না।

তারপর রূপা রেগে গিয়ে বলেছিল, তোমাদের ঐ জুয়েল ছেলে নিশীথের সঙ্গে মেশে কেন? নিশীথটা খারাপ, খারাপ।

নিরুপমের সেদিন নিজেরও ভাল লাগে নি, নিশীথ ওর জুয়েল নামটা কলেজে ছড়িয়ে দিয়েছিল বলে। আসলে ওদের কলেজটা ছিল মাইল দুই দূরে, সাইকেল করে যাবার সময় নিশীথ ছিল সঙ্গী। তাছাড়া নিশীথ সেই বয়সেই অনেক কিছু জানতো। নিরুপমের অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করতো। তাই নিশীথ সম্পর্কে ওর একটা নেশা ছিল।

জুয়েল ছেলে! কথাটা এখন মনে পড়লে পরিহাসের মত শোনায়। আর নিশীথের ওপর একটা প্রচণ্ড রাগ জমে আছে নিরুপমের মনে।

রূপাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে নিরুপম বললে, আজ অপিসে অনেক কাজ, বরং তাড়াতাড়ি ফিরবো।

রূপাকে একটুখানি ম্লান দেখালো। যেন ওর ইচ্ছের আর আর কোন দাম নেই।

অপিসে বের হওয়ার জন্যে নিরুপম যখন পোশাক পরে তৈরি হয়েছে, তখন রূপা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমি বুঝি আজকাল টাই বাঁধো না? তোমার অ্যালবামে একটা ছবি দেখছিলাম····

অ্যালবামটা দেখেছে রূপা। সারা দুপুর তো কোন কাজ থাকে না। তাই সব কিছু হাতড়ে বেড়ায়। অ্যালবামটা নিরুপমের টেবিলেই পড়ে ছিল।

বললে, টাই পরে দিব্যি স্মার্ট লাগে তোমাকে, ছবিতে দেখলাম। হাসলো রূপা।

নিরুপমও হাসলো।—তুমি টাই বাঁধতে শিখিয়ে দিয়েছিলে মনে আছে?

একটু থেমে বললে, ঠিক আছে, তুমি যখন বললেই···

ওয়ার্ডরোব খুলে একটা টাই বের করে বললে, দাও বেঁধে দাও।

রূপা হাসিমুখে এগিয়ে এলো। টাই বেঁধে দেবার চেষ্টা করলো। নিরুপম বুঝতে পারলো ওর বাঁ-হাতের অবশ আঙুল-গুলো স্বাভাবিকভাবে নড়ছে না, কিংবা ওর কোন যন্ত্রণা হচ্ছে।

রূপার দু' চোখে দু' ফোঁটা জল চিকচিক করলো, ও হতাশ কান্নার গলায় বলে উঠলো, তুমি বেঁধে নাও, তুমি বেঁধে নাও।

রূপার গলার স্বর কান্না হয়ে গেল।—পারবো না নির্পমদা, আমি আর কিছুই পারবো না।

নিরুপম অস্বস্তি বোধ করলো, না-জেনে রূপাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছে বলে। ও ভরসা দিতে চাইলো, ডাক্তার সেন বলছেন, সেরে যাবে।

তারপর বললে, আমি বেঁধে নিচ্ছি, আমি বেঁধে নিচ্ছি।

আসলে ও আজকাল আর টাই পরে না। আপিসের দত্ত-সাহেবও পরেন না। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আর কেন নিরুপম, গ্রেড তো পেয়ে গেছ। দত্ত-সাহেব খুব সিনিক টাইপের লোক। বলেছিলেন, এফিসিয়ান্সি, টাই, ইংরাজী বুকনি—ও-সব হল সিঁড়ির ধাপ। ওগুলো ওপরে ওঠার জন্যে দরকার, উঠে গেলে আর লাগে না। তখন একটা একটা করে ছাড়তে হয়। দত্ত সাহেব অবশ্য অনেক ওপরে উঠে গেছেন, নিরুপম কোনদিন অত ওপরে উঠতে পারবে না।

তবু রূপাকে খুশি করার জন্যেই ও টাই পরলো। নট দিতে দিতে বললে, তোমার মনে আছে, আমি বাঁধতে জানতাম না, তোমার বাবার একটা টাই এনে তুমি বাঁধতে শিখিয়ে দিলে।

—সত্যি, এত কথা তুমি কি করে মনে রেখেছো? মনে রেখেছে বলে রূপার ভাল লাগলো। বললে, আমি তো তখন বাবাকে রোজ বেঁধে দিতাম। হেসে ফেলে বললো, জানো, আমার একবার অসুখ হয়েছিল, মা বেঁধে দিয়েছিল একদিন, আর আমার খুব রাগ হয়েছিল। কি বোকাই না ছিলাম!

ওসব কথা নিরুপমের কানে গেল না, ও তখন সেই মধুর স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে।

রূপার মা খুব হাসছিলেন। বলেছিলেন, পাগল ছেলে, ও আর এমন কি কাজ, রূপা, শিখিয়ে দে না ওকে।

বাবার একটা টাই এনে নট দেওয়া দেখিয়ে দিচ্ছিল রূপা, তারপর ওর গলায় বেঁধে দিল। রূপার সরু সরু আঙুলগুলো নিরুপমের গলায় ঠেকছিল। তার মধ্যে কি একটা বিচিত্র অনুভূতি। রূপার নিঃশ্বাস পড়ছিল ওব চিবুকে। এত কাছাকাছি সামনাসামনি দাঁড়াল নিরুপমের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠতো। রূপার মার চোখে, বলাপিশির চোখে ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল রূপার কাছে ধরা পড়ে যাবার। ও কিছুতেই জানাতে সাহস পেতে না, এমনি দু'একটা মুহূর্তে ওর বুকের মধ্যে লুকানো একটা চারাগাছ হঠাৎ হঠাৎ কৃষ্ণচূড়া হয়ে উঠতো।

নিরুপম নিজের অজান্তেই অপিসে বসে তার কণ্ঠার হাড়ে হাত ঠেকিয়েছে, রূপার নরম আঙ্গুলের স্পর্শটুকু তখনো যেন লেগে আছে। ও যখন টাই বেঁধে দিতে এসেছিল, পারে নি, কিন্তু আঙ্গুলের স্পর্শের স্বাদটুকু হারিয়ে যায় নি।

একবার সহকর্মী বসু মল্লিক এলেন। বললেন, আপনাকে আজ ব্রাইট লাগছে নিরুপম।

নিরুপম হাসলো। নিজের মনেই দু' আঙ্গুলে টাইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা পাক দিয়ে বুক ঠেলে উঠতে চাইল। আমি তো একটা স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতাম। সেখানে রূপা কেবলই বলতো, ছাখো ছাখো, আমার হৃৎপিণ্ড ঠিক যেন লাল টুকটুকে গোলাপ ফুলটির মত। তার সুগন্ধে ডুব দিয়ে তুমি অনেক দূর চলে যেতে পারবে, অনেক গভীরে। রূপা বলতো, আমিও তোমার হৃৎপিণ্ড দেখতে পাচ্ছি, আমার নিজেরই বুকের মধ্যে সে আছে। তার উত্তাপে কনকনে শীতের বাতকেও আমি পার হয়ে যেতে পারবো। এই ভালো, এই ভালো। তুমি আর কিছু চেয়ো না। তুমি তোমার চোখ সরিয়ে নাও, তুমি আমার হৃৎপিণ্ড দেখতে পাও না, দেখতে চাও না। নির্পমদা, সাবধান সাবধান, তোমার চোখ অন্য সকলের চোখ হয়ে যাচ্ছে।

সত্যি সেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার সময় নিরুপমের চোখ অন্য সকলের চোখ হয়ে যাচ্ছিল। ও মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল রূপার দিকে। রূপার শরীরের দিকে। রূপার শরীর যেন পাহাড় থেকে ঢলে পড়া ঝর্ণা। রূপার হাসিতে ঝর্ণা।

হঠাৎ রাস্তার মোড়ে রূপা দাঁড়িয়ে পড়লো।—আরে এখানেও গোলগাপ্পা বিক্রি হয়? ছোটবেলায় কত খেয়েছি, না নির্পমদা? একদিন কি কাণ্ড, মনে আছে? বেঙ্গলি ক্লাবের ঘাসে বসে বসে মোমফালি খেতে খেতে রাত হয়ে গিয়েছিল, সুধা ছিল সেদিন....বাবা খুঁজতে এসে কি বকুনি।

নিরুপম হেসেছিল। —গোলগাপ্পা, মোমফালি, তুমি কি হিন্দুস্থানী হয়ে গেছ নাকি?

সামনে সামনে এক ভদ্রলোক সমান তালে হাঁটছিলেন, ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেলেই অন্যায় হয়েছে ভেবে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। আর তখনই ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। দেখলো, ফুটপাথের ওপর সারি সারি ফুলের পসরা সাজিয়ে

বসেছে কয়েকজন। বেলফুলের মালা, জুঁই ফুলের মালা, দু' মুঠো চাঁপা কলাপাতার ওপর, রজনীগন্ধার ঝাড়।

রূপা থমকে দাঁড়ালো একজনের সামনে। রজনীগন্ধার দাম জিজ্ঞেস করলো।

একটা পুরোনো ফ্লাওয়ার ভাস ধুলো মেখে খাটের তলায় পড়েছিল, দুপুরে সেটা আবিষ্কার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল রূপা, নিরুপম জানতো না।

নিরুপমের টেবিলের ওপর সেটা এনে রেখেছিল। এবার রজনীগন্ধার স্টিকগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো রূপা।

নিরুপমের মনে পড়লো, ইলুর জন্মদিনে ভাসটা কে যেন উপহার দিয়েছিল। তারপর থেকে উপেক্ষায় পড়েছিল ওটা। অলকা শুধু সব কিছু গুছিয়ে রাখতে জানে, সাজাতে জানে না। শুধু প্রয়োজনের খাঁচায় ও বন্দী হয়ে আছে।

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ বদলি হয়ে যাওয়ায় সন্দীপকে গিয়ে কলেজ হোস্টেলে উঠতে হয়েছিল। সন্দীপ আর নিশীথ দু'জনেই ছিল নিরুপমের বন্ধু।

কবুতরবাগের লোহার ফটকের দু'পাশে দু'খানা ঘর ছিল। বাঁ দিকের ঘরখানা সারিয়ে নিয়ে মিশিরজী হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চকবাজারের দোকানীরা, হিন্দুস্থানী মেয়েরা ভেট আনতো, মানত করতো। আর ফটকের ডান-দিকের ঘরখানা বছরের পর বছর পড়ে থাকতো তালাবন্ধ।

নিরুপম, নিশীথ প্রায়ই সন্দীপকে বলতো, চাবিটা আনিয়ে নে তোর বাবার কাছ থেকে, মালপত্র পাঠিয়ে দিয়ে ঘরখানা সাফসুফ করে ওখানে আমরা ক্যারাম খেলবো। বিশেষ করে

বর্ষাকালে ওদের কোন আড্ডা দেবার জায়গা ছিল না। বেঙ্গলি ক্লাবে বুড়োরা তাস খেলতো, বড়োরা ক্যারম খেলতো। ওদেরই কোন জায়গা ছিল না।

সন্দীপ বলতো, আনবো আনবো। অথচ চাবিটা আনতো না।

মার কাছে নিরুপম ঐ ঘরখানার রহস্য জেনেছিল একদিন। মা প্রায়ই বলতো, সন্দীপের সঙ্গে মিশিশ না। কোনদিন লালচকের কেউ এসে যদি জানিয়ে যেত নিরুপমকে সন্দীপের সঙ্গে কোন চায়ের দোকানে দেখা গেছে, কিংবা স্টেশনে, তাহলে নিরুপমের মা খুব রাগারাগি করতেন।

আসলে ব্যাপারটা ও তখন জানতো না। সন্দীপের বাবা মৃগাঙ্কবাবু ছিলেন পি. ডবলু. ডি-র ওভারসীয়ার। ঠিকাদারদের কাছ থেকে তিনি ঘুষ পেতেন, সবাই জানতো, তাঁর চালচলনেই তা ধরা পড়তো। তারপর কি নিয়ে যেন হঠাৎ একদিন তোলপাড় হ'ল, মৃগাঙ্কবাবুকে রাতারাতি ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হ'ল। নতুন জায়গায় কোথায় থাকবেন, জিনিসপত্র কোথায় রাখবেন, ঠিক করতে না পেরে সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে গেলেন সঙ্গে, আর তাড়াহুড়োর মধ্যে টেবিল আলমারী বাক্স-প্যাঁটরা কবুতরবাগের ঐ ঘরখানায় ভরে দিয়ে তালা বন্ধ করে গেলেন। কথা ছিল, সময়মত একবার এসে নিয়ে যাবেন।

সন্দীপের পড়াশুনোর অসুবিধে হবে বলে ও কলেজ হোস্টেলে রয়ে গেল।

তারপর কি হয়েছিল কে জানে, মৃগাঙ্কবাবু অনেকদিন আর লালচকে আসেন নি।

সবাই জানতো মৃগাঙ্কবাবু ঘুষ খান। ঘুষ না খেলে কেউ অত খরচখরচা করতে পারেন না। তবু সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব ছিল, অনেকে সমীহ করতো। কিন্তু যেই ধরা পড়লেন,

বদলির নোটিস এলো, অমনি রাতারাতি লোকে ওঁর দুর্নাম করে বেড়াতে লাগলো। যেন ওঁর মত ঘৃণার পাত্র আর কেউ নেই।

নিরুপমের বাবা বলেছিল, বাঙালীর নাম ডোবালো লোকটা।

মা বলেছিল, ঐ লোকের ছেলে আর কত ভাল হবে, তুই মিশিশ না ওর সঙ্গে।

সেই সন্দীপ হঠাৎ একবার সত্যি সত্যি চাবি নিয়ে এলো। বললে, চল, ঘরটা খুলে দেখে আসি একবার। সবই তো নতুন করানো হয়েছে; বাবা বলেছে বিক্রি করে দিতে।

ঘরখানা সম্পর্কেই নিরুপমের কৌতূহল হত মাঝে মাঝে। কি আছে ওর ভিতরে জানতে ইচ্ছে হত। নিরুপমের পড়ার টেবিলটা নড়বড় করতো, তাই সস্তায় কিনে নেবে ভেবে ওর আরো কৌতূহল বাড়লো।

তালাটায় জং ধরে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে খোলা গেল। কিন্তু দরজা খুলে আর ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে হল না। ভ্যাপসা একটা বিচ্ছিরি গন্ধ, এক পা এগিয়েই পেছিয়ে এলো সন্দীপ। টেবিল চেয়ার আলমারি কোন্‌টা কি, তখন আর বোঝার উপায় নেই। সমস্ত ঘরখানা এক বিশাল উইঢিবি হয়ে গেছে। সন্দীপ মুখ কাচুমাচু করে বললে, মহারাজদের ডেকে সাফ করে দিতে বললেই হবে। ওখানে মেথরদের মহারাজ বলতো।

নিরুপমেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু হঠাৎ কি মনে করে একটা লোহার শিক এনে ও উইঢিবি ভাঙতে শুরু করলো। লক্ষ লক্ষ উই কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে; ছড়িয়ে পড়ছে।

উইঢিবি ভাঙতে ভাঙতে উইয়ে-খাওয়া আলমারীর পাল্লাটা দড়াম করে পড়ে গেল। ভিতরে যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়ে

গেছে। ওরা তখন দুজনেই খুব হাসছে।

লোহার শিক দিয়ে টেবিলটা খোঁচাতে খোঁচাতে আধ-খাওয়া দেরাজটা টানলো। সেটা ভেঙে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠং করে কি যেন পড়লো নিচে, পা দিয়ে ঘষে দিতেই ওরা দুজনেই অবাক। দুজনেই ঝুঁকে পড়লো। ঝকঝকে হলুদ রঙা·······আরে আরে কি এটা ?

নিরুপম চিৎকার করে উঠলো উল্লাসে, মোহর পেয়েছি, মোহর !

হাতে নিয়ে দেখলো, পড়লো। চকচকে সোনার একটা হাফ-গিনি। একেই নাকি গিনি বলে ! নিরুপম তখন আনন্দে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সন্দীপও চিৎকার করে উঠলো, গিনি, গিনি !

দেরাজের সব উইঢিবি ভেঙে গুঁড়িয়ে গুনে গুনে আটচল্লিশটা হাফ-গিনি পাওয়া গেল ॥

ফিরে এসে নিরুপম বকুনি খাবে জেনেও বাবাকে মাকে বলেছিল সে-কথা।

মা বলল, কেউ ঘুষ দিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে রেখে ভুলে গিয়েছিল।

নিরুপমের বাবা বললেন, গেলি কেন ? শেষে বলবে আরো ছিল, তুই নিয়ে নিয়েছিস।

তা হবে হয়তো। কিন্তু নিরুপমের প্রায়ই মনে হত, এখনো মনে হয়, ঐ গিনিগুলো না পাওয়া গেলে ওর জীবন হয়তো অন্যভাবে গড়ে উঠতো। ওকে নিজের কাছে সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকতে হত না।

ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ মনে হল, সব পাওয়ার মধ্যেই কোথায় যেন একটা মাথা নিচু করার ব্যাপার থেকেই যায়। যে যত মাথা তুলে দাঁড়ায়, ভিতরে ভিতরে সে ততই মাথা হেঁট

করে থাকে।

কারণ প্রত্যেকটি পাওয়ার দাম দিতে হয়। কড়ায় গণ্ডায় নিক্তির ওজনে। নিরুপম জেনে রাখো, বাইরে তুমি যতই বড় হবে, অন্তরে তুমি ততই ছোট হয়ে যাচ্ছো। পাপকে পায়ে মাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পাপবোধ থেকে মুক্তি নেই। এই তো এত এত সময় পার হয়ে গেছে, টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধার স্টিকগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে রূপা, হাসছে, কথা বলছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিরুপমকে অভিনয় করতে হচ্ছে, যেন সেই দিনটির কথা ও ভুলে গেছে। এ আরেক অসহ্য যন্ত্রণা। অসহ্য, অসহ্য। রূপার ক্রমশঃ অবশ হয়ে যাওয়া হাতে, হাতের আঙুলে এত যন্ত্রণা নেই। ওকে তিলে তিলে পুড়তে হয় না, একা একা এভাবে কাঁদতে হয় না।

এই তো সেদিন, অপিসে কিছু নতুন লোক নেওয়া হল। নিরুপম ভেবেছিল ও কোন অন্যায় করবে না। ওদের তিনজন অফিসারের ওপর ভার ছিল ইণ্টারভিউ নেবার। ও ভেবেছিল যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নেবে। দত্তসাহেব নিজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই শুধু একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। বললেন, আমার ক্যাণ্ডিডেট। অন্য দু'জন অফিসারকেও নিশ্চয় দিয়েছিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেগুলো বসে রইলো, ঘামলো, এলো, চলো গেল! আর নিরুপম শুধু অভিনয় করে গেল। অক্ষম রাগে ও দত্তসাহেবের ওপর জ্বলে উঠছিল। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে হল না।

একটি ছেলের চোখে জল দেখেছিল নিরুপম। একজন নাকি বাইরে বেরিয়ে ফেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা জানে না, ঘৃণায় নিজের টাইটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল নিরুপমের।

বৃদ্ধ দাসবাবু একবার বলতে এসেছিলেন, স্যার, আরো তো

অনেক ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল!

নিরুপম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে, যাকে ভাল মনে করেছি সিলেক্ট করেছি।

যেন সত্যি ও যোগ্যতা দেখে বিচার করেছে। যেন নিরুপম নিজেই বিচার করেছে। তা না হলে যে দাসবাবুর কাছে মান থাকে না। কিন্তু ও জানে দত্তসাহেবের কাছে এবং নিজের কাছে ও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

নিরুপমের কেমন মনে হয় সেই প্রথম যৌবনে একবার যে ও মাথা নিচু করেছিল, সেই পাপবোধ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেটাকে চাপা দেবার জন্যেই ও বারবার মাথা তুলতে চাইছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা পাপবোধ ওকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে।

এই সব ভাবনা যখন ওর মাথায় আসে, তখন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কল্পনায় একদিন একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিল ও। কাঠগড়ায় নিরুপম দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ মুখে, ও বলেছে, হুজুর, আমি তো জীবনে একটা অন্যায় করেছি, একটি নিষ্পাপ প্রেমকে হত্যা করেছিলাম। বিচারকের আসনেও নিরুপম বসেছিল, নিরুপম নিজেই। থমথমে গম্ভীর মুখে নিরুপম বলছে, তোমার বিরুদ্ধে এতগুলো অভিযোগ, আমি একটাই উত্তর চাই, গিল্টী অর নট গিল্টী? প্রসিকিউশনের উকিল নিরুপম কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে জজের সামনে দাঁড়িয়ে কাঠ-গড়ার নিরুপমের দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্মম উল্লাসে হাসছে, বলছে, মিলর্ড, ঐ লোকটির বিরুদ্ধে সতেরো দফা অভিযোগ, ও জীবনের পদে পদে অন্যায় করে গেছে, এবং ওর বিবেক বলে কোন বস্তু নেই। আর তখনই কাঠগড়া থেকে নিরুপম আর্তনাদ করে উঠলো, হুজুর, ওঁকে বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বাস করবেন না।

পাপবোধ আছে বলেই হয়তো বারবার পাপের দিকে ফিরে যেতে হয়। এই তো নিরুপম এত স্বপ্ন দেখছে, রূপার

সঙ্গে সুন্দর সম্পর্কটা আবার ফিরিয়ে আনাব। কিন্তু পারছে না। এক এক সময় ওর মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড লোভ জাগছে। রূপা কাছে এসে দাঁড়ালেই ওর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। রূপাকে ঘিরে এত অস্বস্তি এত দুশ্চিন্তা· ঐ পাপবোধের জন্যেই। অলকা ফিরে এসে কি ভাববে! বিপিন কি মনে করেছে, অবনীবাবু কিংবা সুহাসবাবুর মেয়েরা!

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুহাসবাবুর মেয়ে ঝুমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঝুমার চোখে হঠাৎ একটা আতঙ্ক দেখেছিল নিরুপম। নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তাদের ফ্ল্যাটের দরজার আড়ালে। অথচ আগে কতদিন ঝুমা ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে, দেখা হলেই কথা বলেছে। এখন ওদের সকলের চোখে নিরুপম একটা ক্রিমিনাল। ওর এতদিনের তিলে তিলে গড়ে তোলা ভদ্র শিক্ষিত চরিত্রবান মানুষের ছবিটা হয়তো রাতারাতি নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা কিছুই হয়নি, ওর পাপবোধই শুধু ওকে ভাবিয়ে তুলছে।

॥ আট ॥

ছি ছি ছি। তিনটি মাত্র শব্দ, একটা প্রচণ্ড ধিক্কার।

একটা সুখের গুনগুনুনি এইমাত্র ওর শরীরে দোলা দিয়ে গেছে। আরেকটু হলে ও হয়তো শিস দিতে দিতেই নামতো। এইমাত্র রূপা অভিমানের চোখে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। নিরুপমের কাছে রূপার ঐ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা খুব ভাল লেগেছিল, ওর মুগ্ধ দৃষ্টি রূপার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল, ও হেসে ফেলে হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখলো। রূপা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, চোখ নামিয়ে নিরুপমের শার্টের বোতামে হাত রেখে বললে, তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসো, ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, নির্পমদা। নিরুপম রূপার দু কাঁধে দুটো হাত রেখে ঝাঁকানি দিয়ে হেসে ফেলে বললে, তাড়াতাড়ি ফিরবো। রূপা তখনো ওর বুকের বোতাম নিয়ে দু' আঙ্গুলে খেলা করছে। নিরুপমের কথা শুনে রূপা লাজুক লাজুক চোখ তুলে বললে, সত্যি বলছো!

অপিস বেরোনোর সময় নিরুপমের মনে হচ্ছিল, রূপা যেন তখনো ওর বুকের বোতামটা ছুঁয়ে আছি। খুশিতে ওর ছোট বেলার মত শিস দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে নামতে চুনকাম করা সাদা ধবধবে দেয়ালে চোখ পড়ে গেল নিরুপমের। কাঠকয়লার কালির দাগটায়। কালির দাগটা দেয়ালের গায়ে নয়, কেন নিরুপমেরই

ধোপদুরস্ত পোশাকে। কিংবা এতদিনের যত্নে গড়া ওর পরিচ্ছন্ন চরিত্রের গায়ে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পায়ের গতি আপনা থেকেই থেমে পড়েছিল। দেখলে সিঁড়ির পাশের দেয়ালে কে কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রেখেছে 'ছি ছি ছি'। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মুখ ছাই হয়ে গেল। এইমাত্র একটা সুখের তুবড়ি থেকে আলোর ফুলকি উঠছিল আকাশ ছুঁয়ে, ঐ তিনটি শব্দ মুহূর্তের মধ্যে ওকে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

নিরুপম চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ ওকে দেখেছে কিনা, দেখছে কিনা। মেয়েলি হাতের ঐ লেখাটা ওর যেন চোখেই পড়ে নি এমনি ভাব করে ও দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে। যেন ওর পায়ের শব্দ হলে এখনই কেউ দরজা খুলে উঁকি দেবে। যেন ঐ লেখাটা ও দেখেছে ওরা জানতে পারলেই ওর গায়ে কলঙ্ক লাগবে, যেন না দেখতে পেলেই ও নির্দোষ।

রাগে লজ্জায় অপমানে ওর তখন কান ঝাঁঝাঁ করছে। নিমেষের জন্যে রূপার ওপরেই ওর অসন্তোষ গিয়ে পড়লো। যেন রূপা এসেই ওর সমস্ত স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে অলকার ওপরও মনটা বিষিয়ে উঠলো। এই যে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কৌতূহল, অবিশ্বাস, আলোচনা, এদের কোন একজনকে নিয়েও নিরুপমের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। দুশ্চিন্তা তো অলকার জন্যেই। একটু সচ্ছলতা, একটু পদমর্যাদার বিনিময়ে দাসখত লিখে দিয়েছে ও দত্তসাহেবকে। তেমনি একটা অভ্যস্ত জীবনের স্বস্তির বিনিময়ে ও কি অলকাকেও একটা দাসখত লিখে দিয়েছে নাকি।

এক এক সময় ওর তাই বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করে।

নিরুপম ভেবে দেখবার চেষ্টা করলো 'এর আগেও ঐ 'ছি ছি ছি' লেখাটা ওখানেই ছিল কিনা। হয়তো চোখে পড়েনি। হয়তো নিরুপমের সঙ্গে ঐ ধিক্কারটুকুর কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু না, সাদা ধবধবে দেয়ালে অত বড় অক্ষরে লেখা কাঠকয়লার দাগটা আগে ছিল না। থাকলে ওর চোখে পড়তোই। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল রূপাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বের হওয়ার সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে গেল, সুহাসবাবুর মেয়েরা গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে একদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে চোখে চোখে কি যেন বলাবলি করেছিল। সিঁড়িতে দেখতে পেয়ে ঝুমার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

—আপনাকে খুব ওয়ারিড মনে হচ্ছে নিরুপম, কি ব্যাপার বলুন তো। বসুমল্লিক হঠাৎ ওর টেবিলের সামনে এসে বললেন।

অপিসে কাজের ফাঁকেও বারবার ঐ তিনটি শব্দ ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। প্রশ্ন শুনে ও তাই বিব্রত বোধ করলো। হেসে উঠে দুর্ভাবনা চাপা দেবার চেষ্টা করলে।

না, প্রতিবেশীদের কিংবা অলকাকে ওর ভয় নেই। ও হয়তো নিজেকেই ভয় পাচ্ছে, নিরুপম ভাবলো। আমরা তো সকলেই অহঙ্কারের ঘরে বন্দী। শত শত ইচ্ছের টুঁটি টিপে নিজের সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছি, সেই ধারণাটাকে, সেই ছবিটাকেই আমরা ভালবাসি। নিজেকে নয়। অ্যালবামের ছবির মত।

অফিসের বন্ধুর সঙ্গে সেই যে পাসপোর্টের ছবি করাতে গিয়েছিল একদিন, মনে পড়লো। যেদিন আনতে গিয়েছিল, ষ্টুডিওর লোকটি তখন একটি নেগেটিভের ওপর তুলির আঁচড় দিচ্ছিল। প্রশ্ন শুনে বলেছিল, এর নাম ফ্ল্যাটারি। হেসে

বলেছিল, কেউ নিজের ছবি চায় না স্যার! সবাই একটা বানানো ছবি চায়। কোন্ অ্যাংগল থেকে তাকে ভালো দেখাবে, কোথায় আলো ফেললে, সব শেষে এই ফ্ল্যাটারি। এ তো স্যার একটা অন্য লোক হয়ে গেল, কিন্তু সেটাই চায় সকলে।

ঠিকই। নিরুপম ভাবলো, মানুষ নিজেকে ভালবাসে না, একটা তৈরী করা ইমেজকে ভালবাসে। আমি চাইছি একটা ভদ্র শিক্ষিত সজ্জন মানুষের ছবি, তাতে যেন কলঙ্কের দাগ না পড়ে। একটা গুণ্ডা কিংবা খুনী হয়তো চায় তাকে লোকে যেন ভয় পায়। তার সেই ইমেজটাকেই সে ভালবাসে। সেটাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তার জন্যে সত্যিকারের মানুষটা যদি দমবন্ধ হয়ে মরে যায়, মরুক।

অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই ও অলকাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, কিন্তু এখনো উত্তর দিল না কেন অলকা?

দোতলায় ঝুমাদের সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন মিস্টার সেন, একটা বড় ওষুধ কোম্পানির কেমিস্ট। এখন তো আর সুহাসবাবুকে গিয়ে বলা যায় না, রূপার কথা ঝুমারা ভাববে, সকলে সন্দেহ করছে বলে অজুহাত দিতে এসেছে, অবনীবাবু সেই যে দেশলাই চাইতে এসেছিলেন, তারপর থেকে একেবারে চুপচাপ। নিরুপম ভাবলো বাড়ি ফেরার সময় বরং মিস্টার সেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে, বেল বাজাবে।

—মিস্টার সেন বাড়ি আছেন?

সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নেবার চেষ্টা করলো নিরুপম।

মিস্টার সেন যেন বেরিয়ে এলেন, আসুন, আসুন, নিরুপম ভিতরে ঢুকবে না, আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম, আপনারা তো ডাক্তার-টাক্তার হাসপাতাল সবকিছুর খবর

রাখেন, সাংঘাতিক একটা বিপদে পড়ে গেছি, স্ত্রী তো জামসেদপুর গেছে কয়েকদিনের জন্যে। এদিকে একটা ঝামেলা এসে পড়েছে কাঁধে, কানপুর থেকে মানে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা দূরেরই, কিন্তু, এসে পড়েছে, কি করব বলুন।

নিরুপম ভেবে নিলো কিভাবে রূপার অবশ হয়ে যাওয়া হাত, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদির কথা বলে কোন্ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবে, তার পরামর্শ চাইবে। ব্যস, তা হলেই খবরটা সব ফ্ল্যাটগুলোয় ছড়িয়ে পড়বে। মিস্টার সেনের স্ত্রীর কাছ থেকে ঝুমাদের কাছে, সেখান থেকে অবনীবাবুর ফ্ল্যাটে।

নিরুপম মনস্থির করেই ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল অফিস থেকে ফেরার সময়। ছি ছি ছি লেখাটির দিকে তাকালো না। জ্বলন্ত সিগারেট ধরা ওর হাতের আঙ্গুল কাঁপছিল। মিস্টার সেনের দরজায় বেল টেপার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়েই থেমে পড়লো ও। মিস্টার সেন নেই। কপাটে একটা তালা ঝুলছে।

সারাদিন ধরে বানিয়ে রাখা প্ল্যানটা ভেস্তে যেতেই নিরুপম কেমন মুষড়ে পড়লো। রূপার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার কাঁটা বুকের মধ্যে খিচখিচ করলো।

বিপিন পাজামা আর পাঞ্জাবি দিয়ে গেল। পোশাক বদলে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে দিল নিরুপম। কিন্তু একটা অভিমান গুমরে উঠলো ওর বুকে। রূপা আসছে না কেন। ও তো আশা করেছিল পাঞ্জাবি আর পাজামা নিয়ে রূপাই এসে দাঁড়াবে। সকালের মত ওর বুকের বোতামে হাত দিয়ে কথা বলবে। তখন ওর সমস্ত দুশ্চিন্তা সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। রূপাকে হঠাৎ মনে হল অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ও হয়তো শুধু নিজের অসুখের কথাটাই ভাবছে। প্রতিদিন ইনজেকশন নিতে যাবার কথা, ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়া। স্মিতহাস

মুখে একবার কাছে এসে দাঁড়ানোর কথা ভুলে গেছে। অথচ নিরুপম কতকগুলো অকারণ ঝঞ্ঝাট মাথায় নিচ্ছে।

নিজের মনেই হেসে ফেললো নিরুপম। ও তো একেবারে ব্যবসাদারদের মত কথা বলছে। অকারণ রিস্ক নেবো কেন, যদি না মুনাফা ওঠাতে পারি, শেঠজীরা বলে। ওরা চায় শুধু লীডাররা অকারণ রিস্ক নেবে, কিংবা তাও চায় না। জীবনের রিস্ক নিয়ে আর কেউ সাধারণ মানুষ মুনাফা ওঠাতে গেলেই ওদের ঘোর আপত্তি। নিরুপম কি ঐ ব্যবসাদারদের মত হয়ে গেল নাকি!

ডেকচেয়ারটায় গা এলিয়ে পড়ে থেকেও ওর বুকের মধ্যে একটা কষ্ট গুমরে উঠতে চাইলো।

কলঘরে যাবে বলে নিরুপম উঠে দাঁড়ালো। খুটখাট কি একটা শব্দ হল পাশের ঘরে। বুবুনের ঘরে। মাঝখানের দরজাটার দিকে তাকালো ও। না, দরজাটা বন্ধ। টার্কিশ তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে কলঘরে যেতে যেতে বারান্দার দিকের দরজাটা দিয়ে বুবুনের ঘরের ভিতর তাকালো একবার।

ভিতরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠলো। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। অলকা, অলকা বসে আছে! একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় আর দুরন্ত ভয় ওকে নাড়া দিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

একটি মুহূর্ত শুধু। অস্ফুটে নিরুপম কি যেন বলে উঠেই চুপ করে গেল। রূপা পিছন ফিরে বসেছিল, তার আগেই মুখ ফিরিয়ে শব্দ করে হেসে উঠেছে।

হাসতে হাসতে বললে, একেবারে চমকে গিয়েছিলে, না নিরূপমদা?

নিরুপম নিজেও হাসছে তখন। সত্যি, চমকে গিয়েছিল নিরুপম।

রূপা হাসতে হাসতে বললে, চাবির গোছা তো হাতে তুলে

দিয়ে গেছ। ভাবলাম, কি করি, কি করি। আলমারী খুলে অলকা বৌদির শাড়িখানা পরতে ইচ্ছে হল। ভাবলাম, তুমি ফিরলে একেবারে অবাক করে দেব।

ও যে হঠাৎ অলকা মনে করে চমকে গিয়েছিল, সে-কথা ভেবে স্নান করতে করতে নিরুপম নিজের মনেই হাসছিল। প্রথম দিনই অপিস বেরিয়ে যাওয়ার আগে ও একটা দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল ঐ চাবির গোছাটা নিয়ে। অলকা ওকে বারবার সাবধান করে দিয়ে গেছে, চাবির গোছাটা যেন কাছছাড়া না করে।

কি করবে ওটা নিয়ে, নিরুপম সেদিন ভেবে পায় নি। রূপার জন্যে শুধু বুবুনের ঘরটা খোলা রেখে যাবে? নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল। নিরুপম কিনা রূপাকে বিশ্বাস করে চাবির গোছাটা দিতে পারবে না। একবার নিরুপমের মনে হয়েছিল, প্রেম, ভালবাসা, সুন্দর সম্পর্ক এ-সব ফাঁকা বুলি, কোন সত্যি নেই তার মধ্যে। তা না হলে, রূপা, সেই রূপাকে ও চাবির গোছাটা দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না। না না, রূপাকে অবিশ্বাস করছি না, নিজের মনকে বোঝাতে চাইল। আসলে ও হয়তো সাবধানে রাখবে না, আর বিপিনকে তো বিশ্বাস নেই। অলকা যদি জানতে পারে রূপার কাছে চাবির গোছাটা ও রেখে যেত। তখন কি মনে করবে কে জানে।

স্নান করতে করতে নিজের মনেই হাসলে নিরুপম। ও যে শেষ অবধি চাবির গোছা ওর হাতে তুলে দিতে পেরেছিল, তার জন্যে মনে মনে খুশি হল।

কিন্তু হঠাৎ অলকার শাড়িটায় রূপা ওকে চমকে দিতে চাইলো কেন? শুধুই একটা ছেলেমানুষি খেলা? নাকি ভিতরে ও বদলে গেছে, অলকার ভূমিকায় নিজেকে মানায় কিনা দেখে

নিচ্ছে? ভাবতেই নিরুপমের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে অলকা বুবুন ইলুর কথা ওর মনকে তোলপাড় করে তুললো।

॥ নয় ॥

রূপার বাবাকে লালচকের সবাই সমীহ করতো। খানিকটা ওর চেহারার জন্যে, খানিকটা ওর পদমর্যাদার জন্যে। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্যবান খাটো চেহারা, হাবভাব হাঁটা-চলা সব ছিল যুবকদের মত। শুধু ব্রাকেটের মত ওঁর পুরুষ্টু সাদা গোঁফজোড়া আর মাথার ফিকে হয়ে যাওয়া সাদা চুলেই ওর বয়স ধরা যেত। এই এই বয়সেও সাদা হাফপ্যাণ্ট আর হাফ-হাতা সাদা সার্ট পরে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে বিকেলে যখন সিভিল লাইনসের দিকে টেনিস খেলতে যেতেন, তখন মনে হত ওর চেহারার সঙ্গে গোঁফ-জোড়া যেন বেমানান। আসলে বয়সও নাকি ওঁর এত বেশি ছিল না। নিরুপমের বাবা বলেছিলেন, ওদের বংশের ধারাই নাকি ঐরকম, কম বয়সেই চুলদাড়ি পেকে যায়।

সরকারী অফিসারদের মধ্যে ওঁর প্রতিপত্তি ছিল অগাধ। হিন্দুস্থানীরা বিপদে আপদে ওঁর কাছেই ছুটে আসতো। বলতো, সরকার, আপ হি খুদ মালিক। আপনি রাখলে আছি, আপনিই ভরসা। ওরা সমীহ করে বলতো, সরকার। বাঙালীদের কাছে ছিলেন গুপ্তসাহেব।

রূপার বাবার ব্যবহারে কিন্তু কোন রাসভারী ভাব ছিল না। রূপার সঙ্গে যেমন, রূপার মা'র সঙ্গেও তেমনি কথা বলতেন হাসিঠাট্টা ইয়ার্কির ঢঙে। যেন বন্ধু সবাই।

রূপার মা ছিলেন খুব সুন্দরী, একটু রোগা, মাঝে মাঝে

অসুখে ভুগতেন। হাসিখুশি মানুষটির মধ্যে রোগের জন্যেই হয়তো মাঝে মাঝে একটা বিষণ্ণতা ছিল। নিরুপমরা বলতো, বুলাপিসি। কেন বলতো নিরুপম, কোনদিনই ভালো করে বুঝতে পারেনি। কারণ সম্পর্কটা ছিল যেমন দূরের, তেমনি জটিল।

রূপার মা যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি আবার সাজগোজ ভালবাসতেন। নিরুপম যখনই গেছে রূপাদের বাড়ি, পরিপাটি ছিমছাম চেহারাটা দেখেছে। একদিন প্রচণ্ড গরমে গিয়ে হাজির হয়েছিল নিরুপম। রূপার মা স্নেহের স্বরে ধমক দিয়েছিলেন, লু বইছে বাইরে, এই গরমে কেউ বেরোয় বোকা ছেলে! আদর করে তরমুজের শরবত বানিয়ে খাইয়েছিলেন নিরুপমকে।

নিরুপম রূপাকে বলেছিল, তুমি খাবে না ?

তরমুজের শরবত যেন কি এক বিস্বাদ এমন মুখচোখের ভাব করে রূপা বলেছিল, না বাবা, ওসব আমায় ভাল লাগে না।

রূপার বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, খা খা, তরমুজ খেলে তরমুজের মত রঙ হবে।

সবাই হেসে উঠেছিল।

আরেকবার, তখন শীত পড়েছে, এক ছুটির সকালে রূপাদের বাড়ি গিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে রূপার বাবা বাড়ির সামনে মাঠে সাদা হাফপ্যাণ্ট পরে কোদাল নিয়ে মাটি কোপাচ্ছেন, আর সবাই হাসাছে। রূপার মাও।

কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! না, ওদের ব্যাডমিণ্টন খেলার কোর্ট তৈরি হবে।

ওদের বাড়ির একপাশে ফুলের বাগান ছিল, বাগানের যত্ন নেবার জন্যে মালী ছিল। নিরুপম দেখলো, একপাশে মালীটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, আরেক পাশে রূপা আর কালেসাহেবের দুই মেয়ে গঙ্গা যমুনা।

ওরাও খুব হাসছিল, নিরুপমকে দেখেই কেমন লজ্জায়

গুটিয়ে গেল। রূপা বোধহয় সে-সময়ে যমুনার হাতে একটা চিমটি কেটেছিল।

রূপার বাবা আসলে বাগান-পাগল মানুষ ছিলেন। কখনো ট্রিমিং করার বিরাট কাঁচিটা নিয়ে, মেহেদির বেড়ার ডালপালা ছেঁটে সমান করতেন নিজের হাতেই; কখনো ফুলের চারা বসানোর সময় মালীকে দেখিয়ে দিতেন।

নিরুপম, রূপা আর মালীটা ফিতে ধরে মাপ করেছিল, রূপার বাবা আর মালীটা কোদালে কুপিয়ে দাগ টেনে দিয়েছিল। তার ওপর চুনের গুঁড়ো দিয়ে দিব্যি একটা কোর্ট তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতিদিন বিকেলে রূপারা ওখানে ব্যাডমিণ্টন খেলতো। গঙ্গা, যমুনা, কবুতরবাগের মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী।

কবুতরবাগের ফটকের ডানদিকের ঘরখানা সাফসুফ করে তখন নিরুপমদের আড্ডা বসে গেছে। সন্দীপ, নিশীথ, ব্রিজলাল, আরো অনেকে এসে ক্যারাম খেলতো, আড্ডা দিত, নিরুপমরা লুকিয়ে নিশ্চিন্তে সিগারেট খেত। ওদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করে আড্ডা দিয়ে এক একদিন নিরুপম ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতো, মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি নিয়ে। রূপার সঙ্গে দেখা না হলেই ওর খুব কষ্ট হত, যেন দিনটা পরিপূর্ণ হল না, কি যেন বাকি রয়ে গেছে।

নিরুপমের মা একদিন বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, তুই অত বুলাদের বাড়ি যাস কেন? বুলার মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে।

মা'র সামনে মুখ তুলে তাকাতে ওর সেদিন ভীষণ লজ্জা করছিল। রাগ হয়েছিল মা'র ওপর। চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল।

তারপর থেকে ও চেষ্টা করতো নিজেকে বেঁধে রাখার। রূপাদের বাড়ি না যাওয়ার। তছাড়া রূপারা তো বিকেলে

ব্যাডমিণ্টন খেলতো। রূপা আর মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী। গঙ্গা আর যমুনা। রূপার মা একটা চেয়ারে বসে খেলা দেখতেন। নিরুপম একদিন গিয়ে পড়েছিল, একটুখানি খেলেই সেদিন গঙ্গা আর যমুনা র‍্যাকেট নামিয়ে রেখে বলেছিল, মাস্টারসাব আসবে, জলদি জলদি ফিরতে বলেছেন পিতাজী। নিরুপমকে ওরা লজ্জা পেত, কিংবা ওদের বাড়িতে হয়তো নিষেধ ছিল।

মিশিরজীর মেয়ে সর্সতীও চোখ নামিয়ে রূপার মা'র পাশে গিয়ে বসলো; রূপাকে বললে, তুম দোনো খেলো।

নিরুপম তাই পর পর কয়েকদিন গেল না। নিজেকে আটকে রাখলো। ওর কেবলই মা'র কথাটা মনে পড়ছিল।—হ্যাঁ রে তুই বুলাদের বাড়ি যাস কেন? বুলার মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে।

শেষে একদিন নিজেরই অজান্তে কখন ওদের বাড়ির রাস্তা ধরেছে। তখন সন্ধ্যে নামছে, নিরুপমের মনে হ'ল এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের খেলা শেষ হয়ে গেছে। ও গেলেই ওদের খেলা নষ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় ছিল।

ও গিয়ে পৌঁছতেই সর্সতী চলে গেল আরতির সময় হয়ে গেছে বলে। সন্ধ্যেবেলায় মিশিরজীর মন্দিরে ওকে ধূপধুনো জেলে দিতে হ'ত, পুজোর থালা সাজিয়ে দিতে হ'ত। যমুনাকে আটকে রাখার চেষ্টা করলো রূপা, সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো. গঙ্গা পিছনে পিছনে। রূপা নিশ্চয় যমুনাকে কিছু বলেছিল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পায়রা ওড়া বন্ধ হয়ে গেছে, দু' একটা দলছুট পায়রা শুধু রূপাদের বাড়ির আনাচে কানাচে বসে আছে। ব্যাডমিণ্টন খেলার নেট টাঙানো ছিল, মালীটা এসে খুলে নিয়ে গেল। আর রূপা যমুনার পিছনে পিছনে খানিকটা ছুটে গিয়ে ফিরে এলো, এসে ঘাসের ওপরই বসে পড়লো।

নিরুপম একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ওর মুখোমুখি বসলো।

রূপা ওর ছু' হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে মৃছু মৃছু হাসছিল নিরুপমের দিকে তাকিয়ে। নিরুপম কোন কথা বলছিল না। সর্সতী কিংবা গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে মেতে থাকলে রূপার ওপর ওর খুব অভিমান হত। ওর ইচ্ছে হত, ও যেমন সর্বক্ষণ রূপার কথা ভাবে, রূপাও তেমনি ওর কথা ভাববে।

রূপা তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গাঢ় গলায় বললে, তুমি আজকাল আর আসো না কেন বলো তো!

নিরুপম অভিমানী গলায় বললে, তোমার তো আজকাল অনেক বন্ধু। একটু থেমে বললে, আমি এলে তো তোমাদের খেলা নষ্ট হয়ে যায়।

রূপা হেসে উঠলো শব্দ করে।—তাই বুঝি। একটু থেমে বললে, তা ঠিক, যমুনার সেদিন খেলা নষ্ট হল। হাসতে হাসতে বললে, তুমি এলেই ও এত লজ্জা পায় কেন গো নির্পমদা।

নিরুপম বিরক্ত হ'ল। বললে, তার আমি কি জানি। আসলে যমুনাটমুনা ওর কাছে কিচ্ছু নয়। ওর ইচ্ছে করছিল রূপা শুধু ওদের ছুজনেরই কথা বলুক। ওর ইচ্ছে করছিল বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখা কথাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে রূপার সামনে মেলে ধরতে। ওর সাহস হচ্ছিল না। রূপাকে ও যে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তখনই মনে হয় ও যেন বুকের কাছে বসে কথা বলছে, তখনই অনন্ত দূরত্বে।

রূপা চুপ করে বসে ছিল, কি যেন ভাবছিল, আস্তে করে ডাকলো,—এই।

নিরুপম চোখ তুললো, কি বলো।

রূপার গলাটা কেমন কেঁপে গেল।—একটা সত্যি কথা বলবে? বলো না, এই, সত্যি তুমি কাউকে ভালবাসো?

রূপা কি এটুকুও বুঝতে পারে না। নিরুপমের বুক ঠেলে

কত কি বলার কথা বেরিয়ে আসতে চাইলো। আনন্দে ওর চোখের কোণা চিকচিক করে উঠলো।

ও ফিসফিস করে বললে, তুমি কি বোঝো না! তুমি কি কিচ্ছু বোঝো না!

শব্দ করে হেসে উঠলো রূপা।—জানি, জানি। যমুনা তো? বলেই হাসতে হাসতে ও উঠে দাঁড়ালো, বাড়ির দিকে পা বাড়াতে চাইলো।

নিরুপমের গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল। উত্তেজিতভাবে ও বলে উঠল, না না, যমুনা নয়, যমুনা নয়, ওর গলার স্বর চাপা কান্না হয়ে গেল।

র‍্যাকেট হাতে নিয়ে তখন ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়েছে চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে, রূপা ওর কথা শুনে মুখে একটা অস্ফুট হতাশার শব্দ করলো। তারপর হেসে উঠে বললে, বেচারী। মেয়েটা ভীষণ আনলাকি। বলেই বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো, র‍্যাকেট ঘুরিয়ে কাল্পনিক একটা শাট্‌ল কককে একবার এদিক, একবার ওদিক পাঠাতে পাঠাতে।

নিরুপম কি করবে, অসহায়ের মত তীব্র যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। অভিমানের গলায় বললে, আমি চললাম রূপা, আমার কাজ আছে।

রূপা এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, অন্ধকারে বোঝা গেল না, হয়তো অবাক হ'ল, কিংবা ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো, তারপরই বাঁ হাতখানা নেড়ে বলে উঠলো, গুড্ নাইট নির্পমদা, গুড্ নাইট।

সেই বাঁ হাতখানা ক্রমশঃ অবশ হয়ে যাচ্ছিল। রূপা ভেবেছিল অসহ্য যন্ত্রণাটা কনুই ছেড়ে কাঁধ অবধি উঠবে,

তারপর কোনদিন ওর সারা শরীর হয়তো অবশ হয়ে যাবে। প্যারালিসিস। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যেত ওর কোন কোনদিন।

কিন্তু এই ক'দিনের চিকিৎসাতেই বোধ হয় একটু উন্নতি দেখা দিয়েছে। সাতটা দিন পুরো হলেই ডাক্তার সেন আরেক-বার দেখাতে বলেছেন।

খাবার টেবিলের ওপর বাঁ হাতখানা বিছিয়ে রেখে রূপা আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে কি যেন দেখছিল। ও আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, ছাখো নির্পমদা, ছাখো ছাখো। আমি পারছি, আমি পারছি।

রূপার চোখেমুখে একটা উল্লাস ফুটে উঠলো। আর রূপার আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর অনামিকায় নিরুপমের চোখ পড়লো।

সুন্দর একটা মুক্তো বসানো আংটি পরেছে রূপা। আংটিটার দিকে তাকিয়ে রইল নিরুপম।

আর তখনই রূপা ওর মুখের দিকে তাকালো। মৃদু: হেসে বললে, সেই আংটিটাই, বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেবো না ?

নিরুপম পলকের মধ্যে একটা আনন্দের ফোয়ারা 'হয়ে গেল।

॥ দশ ॥

নিরুপমের সবচেয়ে বড় ভয়, সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সেই বিশ্রী ধিক্কারটুকু রূপার চোখে না পড়ে যায়। তা হলেই ছন্দ ভেঙে যাবে, তাল কেটে যাবে। দেয়ালের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা তিনটি শব্দ—ছি ছি ছি। অপমানে লজ্জায় রূপার মুখ হয়তো বিবর্ণ হয়ে যাবে। হয়তো তারপর দু'জনের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যবধান গড়ে উঠবে। কিংবা দু'জনেই অপমানিত মুখ নিয়ে তাকাবে পরস্পরের দিকে, আর ভয়ঙ্কর রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়ে দু'জনে দু'জনের বুকে মুখ ঢেকে সব বলা-কওয়ার ঊর্ধ্বে চলে যেতে চাইবে।

'শোন রূপা, কাল ফিরে এসে ক্লান্ত শরীর নিয়ে আমি যখন বিছানায় শুয়ে ছিলাম, তুমি আমার শিয়রের কাছটিতে এসে বসলে। তুমি অনর্গল কথা বলছিলে, লালচকের দিনগুলির কথা, যমুনার কথা, আর আমি তখন নির্দোষ সুগন্ধে স্নান করছিলাম, তোমার চুল আমার মুখের সামনে লুটিয়ে পড়েছিল, আমি তোমার রেশমের মত হাল্কা চুল মুঠো করে ধরেছিলাম, তুমি এমন কথার মধ্যে ডুবে ছিলে যে সেটুকু তুমি অনুভব কর নি, কিন্তু বিশ্বাস করো রূপা, আমি আমার এই একঘেয়ে জীবনে কোনদিন এমন রামধনুর মধ্যে সাঁতার কাটি নি। তুমি কখনো আবার আমার এত সান্নিধ্যে এসে বসবে আমি কল্পনাও করি নি। শোন রূপা, আমি যা ভেঙে ফেলেছিলাম, তুমি তা আবার গড়ে

তুলছো। সেজন্যেই আমার এত ভয়। তুমি ঐ তিনটি শব্দের নির্লজ্জ ধিক্কারের দিকে যেন চোখ ফেল না।'

নিরুপম যেন একটা অসহায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কারণ রূপা সেই আগের মতই এমন একটা রহস্যময় কুয়াশার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে, যেখান থেকে নিরুপম একেবারে তার হৃদয়ের কাছটিতে কিংবা সূর্য-আড়াল পাহাড়ের ওপারে। রূপা যেন সত্যি একটা অনন্ত রহস্য। ওকে যেন কোন কথাই বলা যায় না, বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত সৌন্দর্যের রেশটুকু কুৎসিত আর নোংরা হয়ে যাবে।

আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই রূপা চলে যাবে। কিন্তু কয়েকটা দিনের জন্যে ও নিরুপমের জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছে, নিরুপম সে জন্যে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। রূপার কাছে ও আর কিছু চায় না। ওর মনে হচ্ছে কতকাল যেন ওর শিয়রের কাছে কোন হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শোনে নি, ওর ঘরের ফুলদানী কোন আন্তরিকতার স্পর্শে এমন পুষ্পিত হয়ে ওঠে নি, কেউ ওকে এভাবে স্বপ্নের আকাশে উড়তে দেয়নি। না, নিরুপম আর কিছু চায় না। ও শুধু সেই নিহত দিনগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তুলে সুখী খাঁচাটার মধ্যেই ফিরে যাবে।

নিরুপম ভাবলো, আমি তো একটা নিষ্পাপ প্রার্থনা জানাচ্ছি, অথচ কেউই আমার ভিতরটা দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।

আজ সেই পাপবোধ থেকে হয়তো নিরুপম মুক্তি পাবে, তবু ওকে অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে দাসবাবুর কাছে বলেছিল, যাকে যোগ্য মনে হয়েছে, তাকেই সিলেক্ট করেছি। অলকার কাছে ও যদি সমস্ত কথা খুলে বলতে পারতো। কিন্তু না, ওর ভয়, সুখের খাঁচাটা তা হলে হয়তো ভেঙে পড়বে। অলকাকে লেখা চিঠির ভাষাটা ওর মনে পড়লো। 'ভেবে-

ছিলাম একা-একা এ ক'টা দিন একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোবো, রেডিওর গান শুনবো, কিন্তু ঘাড়ের ওপর একটা বিশ্রী ঝামেলা এসে পড়েছে, রূপা—সেই যে লালচকের, যাকে বুলাপিসি বলতাম, তাঁর মেয়ে, কি একটা প্যারালিসিসের মত রোগ নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসে উঠেছে। দিনরাত তার ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন, নানান বায়নাক্কা। বলছে তো দু' একদিনের মধ্যেই চলে যাবে।' কথাগুলো মনে পড়তেই নিরুপমের ভীষণ খারাপ লাগলো। অলকার কথা মনে পড়লো, বুবুনের কথা, ইলুর কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মন বলে উঠলো, নিরুপম, তুই একটা স্কাউনড্রেল। আর তখনই বিচারকের আসনে যে নিরুপম বসে ছিল গম্ভীর রাশভারী মুখে, সে একবার ফিরে তাকালো নির্দয় প্রসিকিউটরের তর্জনী তোলা ক্রুদ্ধ নিরুপমের দিকে, আরেকবার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ম্লানমুখ নিরুপমের দিকে, তারপর হাসতে হাসতে বললে, অতীতের নিরুপম যে একটি প্রেমকে হত্যা করেছিল, সে স্কাউনড্রেল ছিল, নাকি আজকের নিরুপম, যে পাপবোধের জোর টানতে টানতে অভিনয় করে চলেছে, এই লোকটিই স্কাউনড্রেল?

নিরুপম ভাবলো, আমি তো শুধু প্রথম যৌবনের লালচক, কবুতরবাগ আর রামলীলার মাঠে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য টুকরো টুকরো নানা রঙের পাথরগুলো তুলে আনতে চাইছি, চারপাশের মানুষ, ঝুমারা, ঐ বিপিন, কিংবা অলকা আমার সেই স্বপ্নটা ভেঙে দিতে চাইছে। আমি তাই অভিমানে নিজের চেহারাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি। কোন ফোটোগ্রাফার ফ্ল্যাটারির তুলিতে এঁকেও আর সেই গোটা মানুষটাকে পাবে না। অ্যালবামে যে ছবিই এনে রাখা হোক না, নিরুপম ভাবলো, মনে হবে আমার মধ্যে যেন আমি নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নিরুপম।

রূপার কথায় তন্ময়তা ভেঙে গেল।

রূপা হাসতে হাসতে বললে, এই, কি এত ভাবছো তুমি? যাবে না?

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নামছিল ওরা দু'জনে। নিরুপমের তখন কেবলই ভয় করছিল। আর তখনই অঘটন ঘটে গেল।

কাঠকয়লা দিয়ে সিঁড়ির দেয়ালে লেখা ধিক্কারটুকুর সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রূপা, হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে দেখলো, তারপর সুর টেনে টেনে জোরে জোরে উচ্চারণ করলো, ছি ছি ছি।

নিরুপমের তখন লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

আশেপাশের ফ্ল্যাটের কেউ হয়তো শুনতে পেয়েছে রূপার কথা জেনে গেছে, যাদের লক্ষ্য করে লেখা, তারা দেখেছে, দেখেছে।

নিরুপম কোন কথা না বলে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, আর তখনই শব্দ করে হেসে উঠলো রূপা। বললে, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বলেই সুর টেনে টেনে ছড়া আবৃত্তির মত করে বললে,—ছি ছি ছি, পরমান্ন বেঁধে বলে ফ্যান ঢালবো কি।

পরমান্ন শব্দটা নিরুপমের মনে একটা স্নিগ্ধভাব এনে দিল। পরক্ষণেই মনে হল ছড়াটার মধ্যে কি যেন একটা গুঢ় অর্থ আছে। কিন্তু সেই অর্থটা কিছুতেই যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে না!

ওরা তখন গঙ্গার ধারে জেটির গ্যাংওয়ে ধরে নেমে চলেছে। পরমান্ন শব্দটা তখনো নিরুপমের মনে একটা পবিত্র সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিচে নেমে এসে জেটির রেলিং ধরে দাঁড়ালো ওরা। দূরে একটা জাহাজের বাঁশি বাজলো। গঙ্গার অন্ধকার জলে কোন ঢেউ নেই। ছায়া-ছায়া নৌকোর সারি নিথর।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রূপা হঠাৎ বললে, আমাদের লালচকের বাড়ির সামনে সেই বড় নালাটা, বর্ষার দিনে টইটুম্বর হয়ে থাকতো, আমরা কাগজের নৌকো ভাসাতাম। মনে আছে নির্পমদা, তুমি কাগজ কেটে নৌকো বানিয়ে দিয়েছিলে....

কাগজের নৌকা ভাসাতাম! কাগজের নৌকো ভাসানোর দিনগুলোই তো সুন্দর ছিল। পবিত্র আর সুন্দর।

নৌকো ভাসিয়ে দিতেই সেটা জলের তোড়ে হেলেদুলে ছুটে যাচ্ছিল, আর রূপা হাততালি দিয়ে হেসে উঠছিল। মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী, সেও দু'একটা নৌকো ভাসিয়েছিল।

আর তখনই নিশীথ কোথায় যেন যাচ্ছিল, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওদের খেলা দেখার অজুহাতে নিশীথ আসলে রূপাকে দেখছিল।

নিশীথ কিংবা ব্রিজলাল কিংবা সন্দীপ, যে কেউ রূপার দিকে তাকালে একটা প্রচণ্ড রাগ নিরুপমের মনে গুমরে উঠতো। ওদের চোখের চাউনি নিরুপমের ভাল লাগতো না। ওদের কেউ রূপার কথা উচ্চারণ করলে ওর মনে হত রূপার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের দৃষ্টির আড়ালে ও রূপাকে পবিত্র আর সুন্দর রাখতে চাইতো।

রূপা একবার আড়চোখে বোধহয় নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল, আর রূপার ওপর নিরুপমের খুব রাগ হয়েছিল। ও চাইতো না রূপা কারো দিকে তাকায়, কারো সঙ্গে কথা বলে। ও ভয় পাচ্ছিল, নিশীথ হয়তো রূপার সঙ্গে কথা বলে বসবে।

ও তাই নিশীথকে নিয়ে ওখান থেকে সরে গিয়েছিল।

নিশীথ সেই বয়সেই মেয়েদের বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। রূপার সম্পর্কে নিশীথের তাই কৌতূহলের শেষ ছিল না। কিন্তু ওদের কাছে রূপার কথা বলতে ওর একটুও ইচ্ছে হত না।

ওকে রূপাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে

নিশীথ খুব চটে গিয়েছিল। ব্রিজলাল আর সন্দীপের কাছে এসে ও একটা বিচ্ছিরি ঠাট্টা করলো নিরুপম আর রূপাকে নিয়ে। তখনো নিরুপম মুখ বুজে সহ্য করেছে।

তারপরই নিশীথ কুৎসিত ভাবে হেসে উঠে বলেছে, তুই তো কিছুই পারবি না নিরুপম, কবুতরওয়ালীর সঙ্গে বরং আমার আলাপ করিয়ে দে। তারপরেও একটা জঘন্য কথা উচ্চারণ করছে নিশীথ। আর তা শুনে ব্রিজলাল হেসে উঠেছে।

নিরুপমের মনে তখন কোন পাপ ছিল না। পরে মনে হয়েছিল নিশীথ যেন রূপাকে একটা নোংরা নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ও তাই কুৎসিত ঠাট্টাটা সহ্য করতে পারলো না। ও পাগলের মত ছুটে গিয়ে নিশীথের সার্টের কলার ধরলো, ঘুঁষির পর ঘুঁষি বসিয়ে দিলো তার মুখে। রাগে থরথর করে কাঁপছিল ও। ওর দু' চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। আর তখনই কি যে হয়ে গেল, ব্রিজলাল যার নিশীথ দু'জনে মিলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নখের আঁচড়ে, প্রতিহিংসার ঘুঁষিতে ওকে বিপর্যস্ত করে দিলো ওরা।

নিরুপমের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল, মনও।

অনেকদিন রূপাদের বাড়িতে যায় নি ও। অকারণ একটা অভিমান হয়েছিল রূপার ওপর। হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। টমটমে করে প্রতিদিনের মত কলেজে যাচ্ছিল রূপা, নিরুপমকে দেখতে পেয়ে টমটম থামাতে বললো।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রূপা, তার আগেই নিরুপমের গলায় চিবুকে কালসিটে দাগগুলো দেখে আঁতকে উঠলো রূপা।

—কি হয়েছে তোমার, নির্পমদা!

নিরুপমের চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সব কথা ও বলতে পারেনি। শুধু বলেছিলে, ওরা তোমার সম্পর্কে একটা বিশ্রী ঠাট্টা করলো, আমি সহ্য করতে পারলাম না।

ওরা! আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে রূপা, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। ওর গলার স্বর কান্না হয়ে যেতে চেয়েছিল।

অবাক হয়ে নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রূপা সমবেদনার গলায় বলেছিল, তুমি ওদের সঙ্গে মিশো না, নিরূপমদা, ওরা খারাপ, খারাপ।

নিরুপম বুঝতে পারে না, ও নিজেই কি করে একদিন নিশীথ হয়ে গিয়েছিল। কিংবা কে জানে, নিরুপমের শরীরের মধ্যেও হয়তো নিশীথরা ঘুমিয়ে থাকে। সাপের মত সেই শয়তানটা হয়তো সব সময়েই আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

সে জন্যেই রূপা আসার পর থেকে নিরুপমের কেবলই নিজেকে ভয়-ভয় করছে। অথচ রূপা এখন ওকে আর একটুও ভয় পাচ্ছে না।

॥ এগার ॥

উইঢিবি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল নিরুপম।

গুনে গুনে আটচল্লিশটা হাফ-গিনি কবুতরবাগের টিউব-ওয়েলের জলে ধুয়ে পকেটে পুরেছিল সন্দীপ। নিরুপম সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, তোর বাবাকে নিয়ে গিয়ে দিবি কিন্তু, তোকে কোন বিশ্বাস নেই। সন্দীপ মুচকি মুচকি হেসেছিল, ও তখন উত্তেজনায় অস্থির। উত্তেজনা কি নিরুপমেরই কম ছিল, ও এসে বাড়িতে না বলে পারে নি। মা বলেছিল; কারো কাছে ঘুষ পেয়েছিল, তাড়াতাড়িতে রেখে ভুলে গিয়েছে বদলির নোটিস পেয়ে। একদিন রূপাকেও বলেছিল, জানো রূপা, আমি উইঢিবির ভেতর থেকে সোনা বের করেছি। শুনে রূপা হেসে উঠেছিল। তারপর সব ঘটনাটা জেনে ঠাট্টা করে বলেছিল, কি বন্ধু তোমার, তোমাকে একটাও দিল না। ওর মনে হয়েছিল, রূপা হয়তো ওর কথা বিশ্বাসই করে নি।

সন্দীপ গিনিগুলো নিয়ে গিয়ে ওর বাবাকে দিয়েছে কিনা ও কোনদিনই জানতে পারে নি। কারণ মৃগাঙ্কবাবু আর লালচকে আসেন নি।

তাই হঠাৎ একদিন ও বাড়ি ফিরে মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মৃগাঙ্কবাবু তখন বারান্দায় বসে নিরুপমের বাবার সঙ্গে গল্প করছিলেন। সেদিন বাড়িতে মাংস রান্না হয়েছিল, নিরুপম দেখলে মৃগাঙ্কবাবুর হাতে এক বাটি মাংস,

উনি পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে খেতে গল্প করছিলেন, মাঝে মাঝে রান্নার প্রশংসা করছিলেন। নিরুপমকে প্রথমটা ওরা কেউই লক্ষ্য করে নি।

নিরুপমের সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। এই লোকটা তো ঘুষখোর, সবাই জানে। ওঁর ছেলে সন্দীপ নিরুপমের বন্ধু বলে মার কত আপত্তি। মিশতে বারণ করতো। তা হলে এই লোকটার সঙ্গে বাবা কেন এমনভাবে গল্প করছেন। কেন এক বাটি মাংস খাইয়ে আপ্যায়ন করছেন। শুধু নিরুপম সন্দীপের সঙ্গে মিশলেই যত অভিযোগ। মা-বাবার কথার সঙ্গে ব্যবহারের কোন মিল খুঁজে পায় নি সেদিন।

মৃগাঙ্কবাবু খাওয়া হয়ে যেতেই কলতলায় হাত ধুয়ে এলেন, আর নিরুপমের বাবা নিরুপমকে ডাকলেন। বললেন, এই যে এসেছে। এই নিরুপম।

নিরুপম মৃগাঙ্কবাবুকে প্রণাম করলো। আর মৃগাঙ্কবাবু ওর মাথায় হাত দিলেন আশীর্বাদ করার ঢঙে। বললেন, সন্দীপ তোমার বন্ধু? তুমি অতগুলো গিনি উদ্ধার করে দিলে। তোমাকে কিচ্ছু দিল না?—বলে হো হো করে হাসলেন।

বললেন, হাত পাতো, দেখি। বলে পকেট থেকে কাগজ মোড়ানো কি একটা ওর হাতে দিয়ে হাতটা মুঠো করে দিয়ে বললেন, যাও, গিয়ে ছাখো।

ও সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখলো। একটা আংটি, খুব সুন্দর একটা আংটি, বড় একটা মুক্তো বসানো।

মৃগাঙ্কবাবু চলে যাওয়ার পর নিরুপমের বাবা আবার ভাল করে দেখলেন আংটিটা। বললেন, খুব সুন্দর। চার আনা সোনা আছে বোধহয়। মা বললো, মুক্তোটা কি ঝকঝকে ছাখো।

নিরুপম ভাবতেই পারে নি মৃগাঙ্কবাবু ওকে একটা আংটি

দেবেন। ওর তো সন্দেহ ছিল, সন্দীপ ওর বাবাকে কিছু বলেই নি।

নিরুপমের বাবার মুখ তখন খুশি-খুশি। বললেন, মৃগাঙ্কবাবু লোক কিন্তু সত্যি খুব ভাল।

মা বললে, অন্য কেউ হলে কিছুই দিত না।

সুধা দেখে শুধু ঠোঁট উল্টেছিল।

শুধু নিরুপমের মনে হয়েছিল, বাঃ বাঃ, একটা আংটি দিলো, চার আনা সোনার, আর অমনি লোকটা ভাল হয়ে গেল তোমাদের কাছে। কিন্তু ও নিজেও খুব খুশি হয়েছিল। আঙুলে পরে আংটিটা বারবার দেখছিল।

মা বললেন, দে, রেখে দিই, তুই তো কোথায় হারাবি।

কিন্তু নিরুপম দেয় নি। ওর তখন কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে রূপাকে দেখিয়ে আসতে। ছ্যাখো রূপা, তুমি তো বিশ্বাস করো নি। ঠাট্টা করেছিলে, সন্দীপ আমাকে একটাও গিনি দেয় নি বলে।

এখন ওর অনুশোচনা হয়, আংটিটা না পেলেই যেন ভাল ছিল। উইঢিবি খুঁড়ে খুঁড়ে ও সোনা পেয়েছিল। সোনার বদলে মুক্তোর আংটি, তারপর মুক্তোটা গলে গিয়ে রূপার দু' চোখে দু' ফোঁটা জল হয়ে গিয়েছিল। সঞ্চয় মনে করে ও যা কিছু জময়ে রেখেছিল, ওর তালাবন্ধ ঘরখানায়, একদিন দেখলো তার সর্বত্র উই ধরে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

কেমন একটা অভিমান তখন নিরুপমকে পেয়ে বসেছে। ওর এক এক সময় সন্দেহ হত রূপা হয়তো ওর মনের ভেতরটা দেখতে পেয়েছে, ও যে রূপার প্রেমের জন্যে কাঙাল হয়ে আছে জানতে পেরেছে, আর তাই কেবলই ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওর সবচেয়ে রাগ হত রূপা ওর সুন্দর বিকেলটা কেড়ে নিয়েছিল বলে। রূপার বিকেলটা তখন গঙ্গা আর যমুনা, মিশিরজীর

মেয়ে সর্সতীর সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলায় কেটে যেত। তাছাড়া ও সময় গেলেই তো রূপা মনে করবে যমুনার জন্যেই ও গিয়েছে। যাবো না, যাবো না, ও মনে মনে ভাবলো, আমি রূপা আর যমুনার মধ্যে শাট্‌ল কক হতে পারবো না।

কিন্তু ও যতই নিজেকে আটকে রাখার চেষ্টা করছিল, ততই রূপার ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই একই রূপা, কিন্তু সে তখন অ্যালবামে একটা অন্য ছবি হয়ে গেছে। একটা শরীরের ছবি। মা বলেছিল, তুই অত বুলাদের বাড়ি যাস্‌ কেন, ওর মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে। ও লজ্জা পেয়েছিল শুনে। নিশীথ বলেছিল, তুই তো কিছুই পারবি না নিরুপম, তার চেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। ব'লে রূপার শরীরের সুন্দরতার একটা স্থূল বর্ণনা দিয়েছিল। ও রেগে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তারপর থেকে রূপা ওর কাছে একটা সুন্দর শরীর হয়ে গিয়েছিল। ও রূপার দিকে আর আগেকার মত নিষ্পাপ চোখ নিয়ে তাকাতে পারতো না। ওর চোখ নিশীথের চোখ হয়ে গিয়েছিল। কিংবা শুধুই বয়স নিরুপমকেও একটা শরীর করে দিয়েছে।

এক একদিন রাত্তিরে যখন ঘুম আসতো না, ও কল্পনায় রূপার চুল চোখ, মসৃণ বাহু, কোমল স্তনের স্পর্শ অনুভব করতো। ও এতকাল শুধু একটা সুন্দর সম্পর্কের নেশায় ছুটে যেত। জানতো না, আরো একটা তীব্র আকর্ষণ রূপার শরীরে লুকিয়ে আছে।

শেষ অবধি দুপুর বেলাতেই গিয়ে হাজির হলো ও। আংটিটা রূপাকে দেখালে ও বিশ্বাস করবে, সত্যি সত্যি সোনা পেয়েছিল নিরুপম। এক পলকের জন্যে ওর ইচ্ছে হয়েছিল ওটা রূপার আঙুলে পরিয়ে দেবার। কিন্তু তখনই মনে পড়লো, মা বলবে, কি করলি তুই আংটিটা। তখনই বললাম, হারিয়ে

ফেলবি। বাবা আধ ঘণ্টা ধরে জেরা করবে, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নিরুপম ওটা বেচে দিয়েছে কিনা। তারপর ওর মনে হল, না, আমি তো কখনো কারো কাছে কিচ্ছু পাই নি। রূপার কাছেও না। প্রাণ গেলেও আমি ওটা কাউকে দিতে পারবো না।

দুপুর বেলায় গিয়ে দেখলে, মালী বাগানে ফ্‌লগাছের ভেলী বানাচ্ছে। ওকে দেখে কাজ থামিয়ে চোখ তুলে তাকালো। বললে, বহেনজী কোঠীতে আছে। মেমসাব নেই, হাসপাতাল।

নিরুপম ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানলে, রূপার বাবা মেমসাহেবকে হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে গেছেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরও রূপার মাকে মাঝে মাঝে দেখাতে নিয়ে যেতেন।

নিরুপম ভেবেছিল, রূপাকে ও অবাক করে দেবে। তাই ও নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখলো। না, কোথাও পেল না। তখন পা টিপে টিপে রূপার শোবার ঘরে ঢুকতেই দরজায় আলো আড়াল হতেই চমকে চোখ তুললো রূপা। হেসে বললে, উঃ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম নির্পমদা।

খাটের পাশে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসেছিল রূপা, একটা টেবল ক্লথ না কি, রঙিন সুতো দিয়ে তার কোণায় নক্সা তুলছিল। ছুঁচ সুতো দিয়ে তেমনি নক্সা তুলতে তুলতেই বললে, ব'সো।

নিরুপম বসলো না। রূপার কাছটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, মাথা নিচু করে একটু ঝুঁকে পড়ে রূপা একমনে নক্‌শা তুলছে কাপড়ের গায়ে। আর তখনই ও যেন রূপাকে নতুন করে আবিষ্কার করলো।

ও দাঁড়িয়ে রইলো। একটা অজানা দেশের দরজা যেন ওর চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেছে। ওর শরীরের রক্ত যেন

মাতাল হয়ে উঠতে চাইলো।

এক মুহূর্ত আগে শিল্পীর আঁকা সুন্দর একটা ছবির মত লাগছিল রূপাকে। ওর সুন্দর মুখশ্রী, ওর চোখ, চিবুকের গড়ন, বাহুর বঙ্কিম রেখা, ওর বসার ভঙ্গিটি নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। নিরুপমের দৃষ্টি তখন পিছলে গিয়ে রূপার গলার উজ্জ্বল সানুদেশ বেয়ে নিরাবরণ সেই অজানা পৃথিবীতে আটকে গেছে।

ওর নিজেরই হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ও তখন শুনতে পাচ্ছে। ওর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত।

নিজেকে সংযত করার জন্যে নিরুপম গিয়ে খাটের ধারে বসলো। দুটি হাঁটুর ওপর দুটি হাত রেখে। নিরুপমের মনে হল ওর সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কাঁপছে।

আর তখনই চোখ তুলে কি বলতে গিয়ে ওর আঙুলে মুক্তোর আংটিটা দেখতে পেল রূপা। বলে উঠলো, দেখি, দেখি, মুক্তো ?—বলে হাত বাড়িয়ে নিরুপমের আঙুল ছুঁলো।

নিরুপম আংটিটা খুলে রূপার হাতে দিল, কোন কথা বললো না।

আংটিটা নিল রূপা, ওকে তখন খুব উজ্জ্বল দেখালো, মুখে তৃপ্তির হাসি। বললে, খুব সুন্দর তো। তারপর কৌতুকে হেসে উঠলো।—যমুনাকে দেবে, তাই না ?

নিরুপম কোন উত্তর দিল না। ও বুঝতে পারলো রূপা ওকে রাগাতে চাইছে।

কিন্তু পরক্ষণেই রূপা বলে উঠলো, দেবো না, কক্ষনো দেবো না, এ আংটি আমার ! এমন জোরের সঙ্গেই বললো, নিরুপমের মনে হল সত্যিই যেন ফেরত দেবে না।

কি হলো কে জানে, নিরুপম বললে, না না, এ আংটি কাউকে দেবার জন্যে না। দিয়ে দাও তুমি, দিয়ে দাও।

নিরুপম হাত বাড়িয়ে আংটিটা ছিনিয়ে নিতে গেল, আর তখনই রূপা হাসতে হাসতে বললে, কক্ষনো না, কক্ষনো ফেরত দেব না আংটি।—বলেই টুপ করে আংটিটা ব্লাউজের বুকে ফেলে দিল।

নিরুপমের শরীরের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর মাতাল হাতখানা ছুটে গেল আংটিটার, ঝকঝকে সুন্দর মুক্তার আংটিটার পিছনে পিছনে।

পলকের মধ্যে রূপার ফর্সা মুখখানা লজ্জায় কেমন যেন হয়ে গেল। নিরুপম দেখলো, রূপার ফর্সা কান, কানের নিচে অনেকখানি অবধি একেবারে রক্ত-জমা লাল হয়ে গেছে। যেন আবীরের ছোপ লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রূপার হাত মুঠো করা ছিল, ও আংটিটা সত্যি সত্যি ব্লাউজের মধ্যে লুকোয়নি, লজ্জায় রাগে ঘৃণায় তীব্র বেগে মুঠোটা ছুঁড়ে দিল রূপা। আর আংটিটা মেঝেতে ছিটকে গিয়ে খাটের পায়ার কাছে পড়ে রইলো।

কিন্তু নিরুপমের তখন আর আংটিটার জন্যে কোন আগ্রহ নেই। ওর শরীরের রক্ত তখন অন্য একটা জগতের ঠিকানা জেনে গেছে।

রূপা বোধহয় ভয় পেল। কিংবা লজ্জা। কিন্তু নিরুপম তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ওর সমস্ত শরীর তখন একটা ক্ষমাহীন পাপ।

তারপর, তারপর আর ভাবতে পারে না নিরুপম।

সেই দিনটির কথা মনে পড়লেই আজো নিরুপমের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। সেদিনের সেই নিরুপমকে ও চিনতে পারে না। বুঝতে পারে না। একটা পাপবোধ ওকে গ্রাস করে বসে। আত্মধিক্কারে আর অনুশোচনায় ওর মাথা ঝুলে পড়ে।

স্পর্শের মধ্যে এমন একটা বিষাক্ত নেশা আছে, নিরুপম

জানতো না। ওর মন বারবার কেবলই ছুটে যেতে চাইতো রূপার শরীরের কাছে। অথচ একটা আত্মগ্লানি আর লজ্জা ওকে বাধা দিয়েছে। এক একদিন ওর ইচ্ছে হয়েছে আংটিটার ফিরে আনার অজুহাতে ও আবার গিয়ে হাজির হবে রূপার সামনে।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর দিনটা এলো, সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল নিরুপমের জীবনে। রূপার মা'র স্নেহের ডাক—পাগল ছেলে। রূপার বাবা বলতেন, নিরুপম তো একটা জুয়েল! কিন্তু কোনকিছুই ওর মনে পড়লো না, মনে পড়লো না।

ও চোখ বুজলেই আজো দেখতে পায়, রূপার দু'চোখ অবাক হতে হতে প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক হয়ে গিয়ে রাগ আর কান্না হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণা হয়ে যাচ্ছে।

একা একা যখনই ও সেই দিনটির কথা স্মরণ করে, ও দেখতে পায় রূপা অপমানে স্নান করে উঠে ওকে দুটি সবল হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দুটো জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে, সে চোখের দৃষ্টিতে সীমাহীন ঘৃণা। নিরুপম শুনতে পায়, রূপা চিৎকার করে বলছে, তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা করে। নিরুপম দেখতে পায়, রূপার দু'চোখ ভাসিয়ে দু'গাল বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু নেমেছে।

নিহত চরিত্রের ভাঙা মেরুদণ্ড আর পাপবোধের অসীম আত্মধিক্কার নিয়ে নিরুপম বিবর্ণ মুখে সেদিন মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল।

নিরুপম আর কোনদিন ফিরে যেতে পারেনি। কোনদিন নিজের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সারা জীবন ধরে ওকে তাড়া করে বেড়িয়েছে ইস্পাতের ফলার মত সেই ঘৃণার ধিক্কার। তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা করে !

॥ বারো ॥

রূপা তুমি ঠিকই বলেছো, আমিতো একটা জন্তু। আমি সেই প্রাচীন ব্যাধের মত প্রেমকে তীরবিদ্ধ করেছিলাম, কারণ প্রেম কি তা আমি জানতাম না। তাকে নিহত করার পর সে আমার কাছে ধরা দিল, অসীম শূন্যতা আর অনন্ত অতৃপ্তির মধ্যে শ্লোকোচ্চারণের মত আমার হৃদয়ের গভীরে প্রেমকে আমি অনুভব করলাম। কিন্তু সেই ক্ষমাহীন পাপ সারাজীবন ধরে আমাকে তাড়া করে বেড়ালো, তাড়া করে বেড়াচ্ছে এই আজও। আমিই সেই ব্যাধ, আমিই সেই বল্মীকাবৃত কবি।

রূপা বলে উঠেছিল, ছাখো ছাখো নির্পমদা, আমি আঙুল নাড়তে পারছি। ওর সমস্ত মুখ তখন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন রূপা যখনই একা একা, ও তখন ওর অসুখের ছুর্ভাবনার মধ্যে ডুবে যেত। নির্জনে বারবার আঙুলগুলো নাড়বার চেষ্টা করতো।

ডাক্তার সেন হেসে হেসে বলছিলেন, বোন্ টি-বি, ক্যান্সার, আর কি কি ভেবেছিলে?

রূপা লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু ও তো সত্যিই আরো কিছু ভেবেছিল। আতঙ্কে ওর ঘুম ভেঙে যেতো। ওর ধারণা হয়েছিল, আঙুল কব্জি কনুই বেয়ে রোগটা ওর সমস্ত শরীর অবশ করে দেবে। সেই ছোটবেলায় দেখা বিকলাঙ্গ

বৃদ্ধটির মত ওর সমস্ত দেহ প্যারালিসিসে গ্রাস করবে। একটা জড়পিণ্ডের মত পড়ে থাকবে ও, কারো কোন করুণা হবে না ওকে দেখে।

প্যারালিসিস, প্যারালিসিস। ওর এই আতঙ্কের কথাটা প্রথম যেদিন শুনেছিল নিরুপম, হঠাৎ ঐ 'জড়পিণ্ড' শব্দটা ওর মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল নিরুপম নিজেই যেন তার জন্যে দায়ী। এই রূপা মেয়েটির মনে স্বপ্ন ছিল, প্রেম ছিল, হয়তো কোনদিন কামনায় রঙিন হয়ে উঠতো ওর মন, কিন্তু তার আগেই নিরুপম তার স্বপ্ন প্রেমকামনা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করে দিয়েছিল।

রূপার কথা ভাবতে ভাবতে তাই নিরুপমের একবার মনে হয়েছিল ওর এই অবশ হয়ে যাওয়া রোগটা আসলে একটা প্রতীকের মত। নিরুপম তো শুধু ওর নিজের পাপবোধের যন্ত্রণায় জ্বলেছে, অপমানে নিজের কাছে মাথা নিচু করে থেকেছে সারাজীবন, কিন্তু রূপার সেই সজীব উজ্জ্বল মনকে চিরকালের জন্যে প্যারালিসিসের মত নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। সে-কথা ভেবে নিরুপম নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নি।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, ভয় নেই ইয়াংম্যান, নিরুপমের কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এ একটা নার্ভের অসুখ, কথা দিচ্ছি সেরে যাবে।

সত্যিই সেরে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল রূপা। আনন্দে অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, ছাখো ছাখো নির্পমদা, আমি আঙুল নাড়তে পারছি, আমার একটুও ব্যথা লাগছে না।

তাকিয়ে দেখেছিল নিরুপম। আর তখনই মুক্তোর-বসানো আংটিটার দিকে ওর চোখ পড়েছিল।

সলজ্জ হেসে রূপা বলেছিল, আমি বলেছিলাম না, ফেরত

দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেব না।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের শরীর মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ও হাত বাড়িয়ে পরম আদরে রূপার আঙুল, আঙুলের আংটিটা স্পর্শ করেছিল।

রূপার মুখে তখন কৌতুকের হাসি। ওর চোখ হাসছে। বললে, আমি জানতাম, আংটিটা তো তুমি আমাকেই দিতে গিয়েছিলে।

নিরুপম কোন কথা বললো না। মাথার মধ্যে তখন একটা শব্দই বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। জন্তু, জন্তু। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপম মনে মনে বললে, নিরুপম, রূপা তোকে আরো নিচে নামিয়ে দিল। তুই নিজেকে ঘৃণা কর। তুই তো আংটিটা রূপাকে দিতে চাস নি। তুই তো তোর মাকে বলেছিলি, হারিয়ে গেছে। কারণ, বিবর্ণ মুখে মাথা নিচু করে তুই যখন বেরিয়ে এসেছিলি, তখন আর আংটির কথা তোর মনে ছিল না অথচ রূপা তোকে ক্ষমা করে দিয়ে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে আছে অনেক সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন দিনের স্মৃতি হিসেবে।

নিরুপম রূপার কথাগুলো শুনলো, কোন উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললে, সত্যি, তোমার অসুখ সেরে যাচ্ছে। দেখো তুমি, ঠিক সেরে যাবে।

মনে মনে বললে, কি অদ্ভুত একটা অভিনয় করছি আমরা দু'জনে। আমরা দু'জনেই স্মৃতির উইঢিবি খুঁড়ে চলেছি, অথচ দুজনেই ভান করছি যেন ভুলে গেছি।

ভুলে গেছি, ভুলে গেছি। কিছুই ভোলে নি ও। আসলে নিরুপমের অস্তিত্ব যেন দু' টুকরো হয়ে দুটো মানুষ হয়ে গেছে। একটা অন্যটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না। ওর অভ্যস্ত জীবনের সুখের খাঁচাটা একদিকে, আরেকদিকে হলুদ জ্যোৎস্নার

আকাশে স্মৃতির ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা উড়ছে, রুপোলি পালক খসে পড়ছে তাদের পাখনা থেকে।

পিন্সেপ ঘাটের জেটির রেলিংয়ে ভর দিয়ে তখন রূপা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে চলেছে। কাগজের নৌকোগুলো কবুতরবাগের বড় নালাটার বর্ষায় টইম্বুর স্রোত বেয়ে ভেসে চলেছে। গঙ্গার অন্ধকার নিথর জলের সারি সারি ছায়া ছায়া নৌকোর সারিও যেন কল্পনায় ভেসে চলেছে।

সেই সময় দূরে কোথায় একটা জাহাজের বাঁশি বাজলো। সেদিকে তাকিয়ে রূপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমরা একদিন ভেবেছিলাম জাহাজে করে কোথাও যাবো, অনেক দূরে কোথাও, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ডিঙ্গিতে করেও কোথাও যাওয়া হল না।

নিরুপম নিজেই যে সে ডিঙিটা উল্টে দিয়েছিল। তাই নিরুপম কোন কথা বললো না।

আর তখনই অলকার কথা মনে পড়ে গেল নিরুপমের। অলকার চিঠিখানার কথা। চিঠির কটা লাইন কাঁটার মত খিচখিচ করে লাগছে। 'রূপাকে বলো ওর বরকে নিয়ে একবার জামসেদপুর ঘুরে যেতে। কিংবা একুশ তারিখ অবধি ওদের থাকতে বলো, আমি ফিরবো। রূপাদের তো কখনো দেখি নি।'

নিরুপমের মনে হল রূপা একা এসেছে এ-কথা স্পষ্ট করে না লিখে ও ভুল করেছে।

ভাবতে ভাবতে ওর নিজের ওপরই মনটা বিষিয়ে উঠলো। মনে হল একটা বেহিসেবী মানুষ, এখন হিসেব করে করে সারা-জীবন তাকে চলতে হবে। একা, একেবারে একা এসেছে রূপা। হৃষীকেশ আসে নি, সে-কথা অলকাকে জানাতে তখন সাহস

হয়নি। এখন সে-কথা লিখলে অলকা কি ভাববে কে জানে। অথচ অলকা তো জানবেই।

নিজের জীবনটাকে নিরুপম একবার চোখের সামনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো। একটা রঙ হারানো বিবর্ণ মানুষ। খবরের কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, ঘাড়ে পাউডারের পাফ বোলায়, যন্ত্রের মত অপিস করে, অকারণ অহঙ্কার দেখায় সাবর্ডিনেটদের কাছে, দাসবাবুর কাছে, দত্তসাহেবকে হেসে হেসে কথা বলতে দেখলে খুশি হয়, তারপর ক্লান্ত হয়ে খাঁচায় ফিরে আসে। যতক্ষণ বিশ্রাম, ততক্ষণ শুধু হিসেব। সংসারের কিংবা আত্মীয়-স্বজনের টুকিটাকি খবর শোনে, অলকার কাছে অভাবের কথা। অফিস ক্লাবে গিয়ে এখন আর তাস খেলতে ভাল লাগে না, আজ শনিবার সিনেমা দেখার দিন, আজ সাত তারিখ ওয়ালডর্ফে গিয়ে চীনে, খাবার খাবো সবাই মিলে, ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা অভ্যস্ত ভালবাসা। নিরুপম মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে। সে শুধু হিসেব করে, এই দিন, এই সপ্তাহ, উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতি, আরো একটা প্রোমোশনের আশা, যা আছে এটুকু থাকবে তো, বুবুনের কলেজ অ্যাডমিশন কত দূরে, তার চাকরির দরখাস্ত, কত দূরে, দাসবাবুর রিটায়ারমেন্টের দেরি নেই, নিরুপমের অনেক দেরি। কিন্তু প্রায় একই ধরণের কথা দুজনেরই। শুধু কতগুলো সংখ্যা, টাকার পরিমাণ। নিরুপম কিংবা দাসবাবুই না, সব মানুষই। একজন ব্যবসাদের সঙ্গে দাসবাবু তার মেয়ের বিয়ে দিতে চান নি। বলেছিলেন, দিনরাত সে তো খেরোর মধ্যে ডুবে থাকবে। জানতেন না, যে কোন মানুষের জীবনই একটা হিসেবের খাতা। সারা জীবন সে কি করেছে? শুধু তো দিনের পর দিন, মাথার মধ্যে কিংবা খাতার পাতায় কেবল কতকগুলো সংখ্যা পর পর সাজিয়ে যোগ করেছে, কিংবা একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা

সংখ্যা বিয়োগ করেছে। হিসেব করেছে উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতির। শুধু টাকায় কেন, সব ব্যাপারে। অথচ কোনদিনই তার উত্তর মেলে নি, সমস্ত হিসেব শেষ অবধি ভুল হয়ে যাবে জেনেও তার হিসেবের বিরাম নেই।

সেই হিসেবের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে রূপাকে মনে হচ্ছে এক ঝলক মুক্তির হাওয়া। জেটী থেকে উঠে এসে গঙ্গার ধারে ধারে গাছ-পাতা-ফুলের ওপর দিয়ে রূপা ওর হাতখানা বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হাসছে, নিরুপমের মনে একটা স্বপ্নের রেশ।

রূপা হঠাৎ আব্দারের ভঙ্গিতে বললে, এই, আমি নৌকোয় চড়বো। আমি কখনো নৌকোয় চড়ি নি।

রূপার কোন সাধ অপূর্ণ রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না নিরুপমের। কারণ সেগুলোর মধ্যেই তো নিরুপম বেঁচে উঠতে চাইছে। ও সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে চাইছে।

দরদস্তুর করে একটা নৌকোয় উঠলো ওরা। ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বসলো।

আর তখনই মাঝি হেসে বললে, আরাম করে বসুন বাবু। হাসিটার মধ্যে কিছু একটা ইঙ্গিত ছিল, 'আরাম' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েছিল।

নিরুপমের ভাল লাগেনি। ও তখন বলতে চাইছে, রূপা, ছাখো তুমি, আরেকবার আমাকে বিশ্বাস করো। যূঁই ফুলের মত অসংখ্য তারাদের আকাশ থেকে তুলে এনে আমি আবার, একটা মালা গেঁথে তুলাবো, সেটা কোনদিনই আর ছিঁড়ে দেব না।

নিরুপমের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বিনিদ্র রাতে প্রার্থনা করেছিল, রূপা কিংবা কোন....! আমাকে আরেকবার সুযোগ দাও। এই পাপ বোধ থেকে আমাকে মুক্তি পাবার সুযোগ দাও। আমি আর কোনদিন ভুল করবো না। রূপা, তুমি আর

কোনদিন আমার হাতে নিহত হবে না।

নৌকো দুলছিল, রূপার শরীর, শরীরের কোমলতা নিরুপমকে স্পর্শ করছিল, নিরুপমের বাহু, দূরে দূরে অসংখ্য আলোর জোনাকি, জেটীতে দাঁড়ানো ছোট্ট জাহাজের আলোক-সজ্জা, চলন্ত লঞ্চের তীব্র আওয়াজ, ওরা দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল, রূপার অন্ধকার শরীর, টুকরো টুকরো কথা, সব।

ফেরার পথে জেটীর গেটের সামনে একরাশ ফুল, ফুলের মালা নিয়ে একজন বসেছিল, একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিরুপম কি যেন ভাবলো। কিন্তু, রূপা তখন প্রগলভ আনন্দ হয়ে এগিয়ে চলেছে। নিরুপম যেতে যেতে একবার বললো, একটা যুঁইফুলের মালা কিনবো ভেবেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে রূপা শব্দ করে হেসে উঠলো।—কি হবে নির্পমদা, মালা কি করবে ? অলকা বৌদি তো এখানে নেই।

যমুনা এখন অলকা হয়ে গেছে। কিন্তু রূপা যেন ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ .নিরুপমের মনে উঁকি দিয়ে গেল। নিরুপমের মত রূপাও দুটো টুকরো মানুষ হয়ে যায় নি তো !

॥ তেরো ॥

প্রিন্সেপ ঘাটের উজ্জ্বল আলোয় সুবেশ সৌন্দর্যের ভিড়। স্নিগ্ধ কলরব। গাছ পাতা ফুলের মায়াজাল ছিন্ন করে প্রখর শ্বেতাভ আলোর উদ্ভাস। তারই মধ্যে মুহূর্তের জন্য ওরা দুটি প্রাণী নির্জনতা হয়ে গেল।

নিরুপমের কথা শুনে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো রূপা, একেবারে নিরুপমের মুখের কাছটিতে। হেসে উঠে বললে, কি হবে নির্মমদা, মালা কি করবে?

নিরুপমের নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। রূপার মুখ হাসছে, চোখ হাসছে, রূপার সমস্ত শরীর, ওর সুতনুদেহ, কোমল স্তনের লুব্ধতা একটা রহস্যের হাসি হয়ে এখনই যেন নিরুপমের শরীর স্পর্শ করবে।

নিরুপমের মাথার মধ্যে সমস্ত চিন্তাগুলো আবার জট পাকিয়ে যাচ্ছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

নিরুপমের মনে হল এক্ষুনি বুঝি ওর, সব প্রতিজ্ঞা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নিরুপম নিজেও।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও রূপার শরীরের হাসি দেখলো, রূপার শরীরের ঘ্রাণ নিলো, রূপার নিশ্বাসের স্পর্শ। ওর ভয় করতে লাগলো, প্রচণ্ড একটা ভয়, নিজেকে।

ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই হঠাৎ এক এক সময়ে রূপাকে ওর রহস্যের মত মনে হয়। ওর হাসিতে, ওর কথায়,

ডাক্তার সেন ওকে আবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ওর আঙুলের গিঁটে গিঁটে, ওর কব্জিতে কইনুয়ে স্টীলের পাতটা ঠুকে ঠুকে রি-অ্যাক্শন পরীক্ষা করলেন। একটু একটু করে তাঁর গম্ভীর মুখ সাফল্যের স্বস্তি হয়ে গেল। অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে দেখালেন, বললেন, মাত্র এক সপ্তাহেই এতখানি উন্নতি আমি আশা করি নি। বললেন, এবার আপনার ছুটি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বললেন, ইনজেকশন চলবে, ওষুধও। কানপুর? তাই না? চিঠি লিখে জানাবেন ছ'মাস পরে, কিংবা দরকার হলে আরো আগে।

ব্যস্। ছুটি, ছুটি।

সঙ্গে সঙ্গে রূপা একটা অফুরন্ত সুখ হয়ে গেল।

নিরুপমের মনে হল ঐ রোগটা, প্যারালিসিসের ভয়, একটা জড়পিণ্ড হয়ে যাওয়া, এ-সব থেকে রূপা মুক্তি পেয়ে গেছে। ওর আবার মনে হল রোগটা আসলে একটা প্রতীকের মত।

কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ ওর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। এই কটা দিনের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনা প্রতিটি কথার মধ্যে ও যেন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে।

নিরুপম তো ওর গোপন পাপবোধের মধ্যে নিজেকে পুড়িয়ে সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে চাইছিল। আর রূপা একেবারে বুকের কাছটিতে দাঁড়িয়ে, রূপার শরীর হাসছিল, যেন নিরুপম এখনই বিদ্যুৎ-স্পর্শ করে ফেলবে, রূপা কি এতদিন ধরে সেই পাপকে ক্ষমা করে স্নেহ দিয়ে পরম আদরে মুক্তোর আংটিটার মত যত্নের ঘরে তুলে রাখতে রাখতে সেটার ওপরই প্রেমকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। নিরুপম জানে না।

নিরুপমের হাতে একখানা চিঠি তুলে দিয়েছিল রূপা। হৃষিকেশকে লেখা।

বলেছিল, ডাক্তার সেন ছুটি দিয়ে দিলেন, এত আনন্দ হ'ল, ওকে, এক্ষুনি এক্ষুনি না জানিয়ে পারা যায়, বলো।

তারপর ওর ব্যাগ থেকে একটা ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর বের করে বলেছিল, রতনবাবুকে একটা ফোন করে দাও না।

নিরুপম আশ্চর্য হয়ে বলেছে, কেন? রতনবাবুকে কেন?

রূপা হেসে উঠেছে আবার সেই শরীর কাঁপিয়ে।—আমাকে তো ফিরতে হবে, না কি?

ফিরতে হবে, ফিরতে হবে। নিরুপমের সমস্ত মন একটা বিষণ্ণতা হয়ে গেছে পলকের মধ্যে। ও যেন ভেবেছিল অনন্ত কাল ওরা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকবে। এই তো নিরুপমের ঘর, ওপাশে বুবুনের ঘরে রূপা। মাঝখানে সেই ইচ্ছের দরজাটা।

হতাশ গলায় নিরুপম বলে উঠলো, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে রূপা? অলকা তো এসে পড়ছে, আজ উনিশ....

রূপা আবার রহস্য হয়ে গেল, উচ্ছল শরীর কাঁপানো হাসি—তাড়াতাড়ি চলে না গেলে অনেক সময় আর যাওয়াই হয়ে ওঠে না যে।

নিরুপম মনে মনে বললে, রূপা তুমি ও ভাবে কথা বলো না। রূপা, তুমি ও ভাবে তোমার স্বতনু যৌবনের উচ্ছলতা আমার সামনে মেলে ধরো না। তুমি শরীর কাঁপিয়ে হেসো না রূপা। তাহলে আমি আর সেই কবুতরবাগের, লালচকের নিষ্পাপ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো না। তুমি আর পাপের উইঢিবিগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে হলুদ আর চকচকে সোনায় গাঁথা মুক্তোটা আবিষ্কার করতে দিয়ো না।

অ্যালবামে আমার ছবিগুলোর দিকে আমি এখন আর

তাকাতে পারছি না। ওর একটাও আমার ছবি নয়। অলকা যেটাকে নিষ্পাপ ভেবেছিল, কিংবা অপিসের পোশাকে যেটাকে বলেছিল আমার মধ্যে আমি নেই, সব অন্য মানুষের ছবি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অনেক মানুষের। অ্যালবামে রূপার কোন ছবি নেই, তাই রূপার ছবিটা একটুও বদলায়নি, বুকের মধ্যে ঠিক তেমনি আছে। রূপা, তুমি সে ছবিটা বদলে দিও না।

তুমি তো চলে যাবে। তোমাকে ফিরতেই হবে। নিরুপম মনে মনে বললো, আমি ভেবেছিলাম তুমি টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে আমাকে আবার গোটা মানুষ বানিয়ে দেবে। জানতাম না, পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আবার জোড়া দিলে সেটা গোলাপ হয়ে ওঠে না।

আমি তো আবার এই সুখের খাঁচাটার মধ্যেই ফিরে আসবো। ঐ অ্যালবামের পাতা উল্টে উল্টে একটি ছবিতেই নিজেকে চিনতে পারবো। ঐ গ্রুপ ফটোখানায়, যার মধ্যে আমি আছি, অলকা আছে, বুবুন ইলু, বাবার গম্ভীর মুখ, মার সাবধানী, 'তুই বুলাদের বাড়ি অত যাস কেন'. সুধা, সুধা, আংটিটা ভাল করে দেখেইনি যখন মৃগাঙ্কবাবু দিয়ে গেলেন, ঐ ছবিটার মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে, ঐ ছবিটাই সকলে চিনতে পারবে।

টেলিফোনটা করে দাও নিরূপমদা, রতনবাবু, তো আজ কালই ফিরবেন, ওঁর সঙ্গে চলে যাবো। তুমি তো আর আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে না।

না, নিরুপম এখন আর রূপাকে কোথাও পৌঁছে দিতে পারবে না। নিজেই যে আর কোথাও পৌঁছবে না। বাকি জীবনটা ও তো শুধু একটা অভ্যস্ত জীবনের খাঁচার মধ্যে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সেটুকুও না হারিয়ে যায়। বাকি জীবনটা ও তো শুধু একটা হিসেবের খাতার মধ্যে থাকবে।

অপিসের দাসবাবু বলেছিলেন, আর তো মাত্র দুটো বছর, তারপরই রিটায়ারমেণ্ট, অনন্ত অন্ধকার। দাসবাবু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছেন। কথা বলেন না, চুপচাপ থাকেন, হিসেব মেলাতে পারেন না। বলেছিলেন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কিই বা জমেছে, কিছু অপবাদ, অনেক শত্রু। অনেস্ট থাকতে চেয়েছিলাম, কেউ বিশ্বাস করেনি, ক্যাপিটল ভাঙতে ভাঙতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কটা দু'চার বছরেই শেষ হয়ে যাবে, তারপর ছেঁড়া পাঞ্জাবি, আধ-পেটা খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে প্রমাণ করে যেতে হবে, দেখুন মশাই দেখুন, তখন আপনারা কেউ বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু আমি অনেস্ট ছিলাম কিনা দেখুন।

দাসবাবুর কথাগুলো শুনে সেদিন নিরুপম মুষড়ে পড়েছিল, একটা আতঙ্ক যেন ওকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। তারপর এক সময় ও নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল দত্তসাহেব সেদিন যদি তাঁর গাড়ি থেকে ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দাসবাবুকে দেখতে পান, নির্ঘাৎ অপিসে এসে হাসতে হাসতে বলবেন, বুড়োটা একেবারে বেহিসেবী। কিংবা বলবেন, ও তো চিরকালই বোকা ছিল।

ও চোখ বুজে নানা রকমের কল্পনার পায়রা ওড়া দেখছিল। কবুতরবাগের পায়রাগুলো উড়ছে, ঝাঁক ঝাঁক পায়রা, আকাশ থেকে ঝকঝকে রূপালী পালক খসে পড়ছে।

তারপর কখন ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিরুপম দেখলো ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। আতঙ্কে ও চীৎকার করে উঠেছিল কিনা বুঝতে পারলো না। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ওর মনে হল, আঃ, পরম নিশ্চিন্তি। জীবনে ও কখনো বোধহয় এত ভয় পায়নি। এমন একটা দুঃস্বপ্ন কখনো দেখেছে কিনা

ওর মনে পড়লো না।

অন্ধকারের মধ্যে ও নিথর নিঃস্পন্দ বসে রইলো। ও নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। নিজেরই অজান্তে একবার বোধ হয় ও হাত বাড়িয়ে অলকাকে স্পর্শ করতে চাইলো। কিংবা ইলুকে। খাটের পাশেই বেবি-কটে ইলু ঘুমিয়ে থাকে। পরক্ষণেই মনের ভুল বুঝতে পেরে ও বিছানা থেকে নেমে আলোটা জ্বালবে কিনা ভাবলো। আর তখনই ওর নিজেকে ভীষণ একা আর নিঃসঙ্গ লাগলো। একা, এক্কেবারে একা। নিরুপমের মনে হল, আমার তো সবই আছে, অলকা বুবুন ইলু, একটা সুখী সংসার, তারা চারপাশে আমাকে সব সময়ে ঘিরে থাকে, কিন্তু জানে না, আমার মত নিঃসঙ্গ কেউ নেই। আমার মত দুঃখী মানুষ কেউ কখনো দেখেনি। কারণ, আমি শুধু যন্ত্রণায় জ্বলি, আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। কোন দুঃখই এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না, কারণ সমস্ত দুঃখ আমি পাপবোধের আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছি।

খোলা জানলার বাইরে মধ্যনিশীথের নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে রইলে নিরুপম। অন্ধকার, অন্ধকার। জানলার চৌকো আকাশে কয়েকটা তারা জ্বলছে, অনেক দূরের কোন একটা বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে কেউ আলো নেবাতে ভুলে গেছে, হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, দূরে কোথায় যেন একটা রিকশার ঠুং ঠুং আওয়াজ হল, অন্ধকার ঘরখানায় বাতাসে কাঁপা নীলাভ নেটের মশারি ছায়া-ছায়া রহস্য-শরীরের মত বাতাসে কাঁপছে ; নিরুপম নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

দুঃস্বপ্নটা তখনো যেন ওর সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে। ওর চোখের মধ্যে।

স্বপ্নের মধ্যে ও দেখেছে আরো গাঢ়ার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা পৃথিবী। কোথাও কোন আলো নেই। নিরুপম নিজেকে

দেখতে পাচ্ছে না, ওর নিজের হাত নিজের কাছেই হারিয়ে গেছে। আর সেই অন্ধকারের দীর্ঘ দীর্ঘ সুড়ঙ্গের অনন্ত দূরত্বের শেষ সীমায় হঠাৎ এক বিন্দু আলো ঝকঝকে একটা সাদা মুক্তোর মত ফুটে উঠলো।

আমি জানতাম, তুমি আংটিটা আমাকেই দিতে গিয়েছিলে।

'বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেব না।'

মুক্তোর বিন্দুটা ফুটে উঠেই নিরুপমের দিকে তীব্রবেগে ছুটে আসতে শুরু করেছে, ছুটে আসছে। নিরুপম দেখতে পাচ্ছে সীমাহীন তমসাবৃত টানেলের ওপার থেকে দৃষ্টির দূরত্ব ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া একটা ইঞ্জিনের হেড-লাইটের মত এক বিন্দু তীব্র আলো কিংবা একটা ঝকঝকে মুক্তো বিদ্যুতের বেগে ছুটে আসছে। আরে আরে, নিরুপমের মতই হঠাৎ সেটা দু-ভাগ হয়ে গিয়ে দুটো মুক্তো হয়ে গেল। কিন্তু তার গতি থামলো না। দুটো মুক্তো পাশাপাশি ছুটে আসতে লাগলো। যত কাছে আসছে মুক্ত দুটো ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, বড় হতে হতে সেই পাশাপাশি সুন্দর স্নিগ্ধ মুক্তো দুটি দুটো জ্বলন্ত চোখ হয়ে উঠলো। অসীম ঘৃণা আর তীব্র ক্রোধের দুটি বিস্ফারিত চোখ হয়ে গেল। নিরুপম তাকিয়ে থাকতে পারছে না। চোখ ঝলসে যাচ্ছে ওর। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দুটি চোখ আরো, বড় হতে হতে ছুটে আসছে তখনো একেবারে নিরুপমকে লক্ষ্য করে। দুটো উল্কাপিণ্ড তীব্রবেগে এসে এখনই যেন নিরুপমকে আঘাত করবে। ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে বোধহয় আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল নিরুপম। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

এখন ও একা, নিঃসঙ্গ!

বিছানা থেকে নেমে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল ও।

তারপর শান্ত হতে হতে এক সময় রূপার কথা মনে পড়ে গেল ওর। রূপার সেই সুন্দর শরীর চোখের সামনে ভেসে

উঠলো। একেবারে ওর বুকের কাছটিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসছে রূপা। ওর বাহুর উজ্জ্বল ত্বক, উন্মুক্ত কণ্ঠতটের লুব্ধ তরঙ্গের আভাস, শরীর দুলছে উচ্ছল হাসির ছন্দে, রূপার চোখ হাসছে।

'আমাকে তো ফিরতে হবে নির্পমদা'।

ফিরতে হবে, ফিরতে হবে। না, সুন্দর স্মৃতির মধ্যে আর বোধহয় ফেরা যায় না।

ঐ তো পাশাপাশি দুখানা ঘর, বুবুনের ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। এই দরজার ওপারে রূপা ঘুমিয়ে আছে। নিরুপমের মন বলছে, একা, সেও নিরুপমের মতই একা এবং নিঃসঙ্গ।

নিরুপম কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওকে এখন নিশিতে পাওয়া মানুষের মত কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিরুপম অন্ধকারে নিঃশব্দে মাঝখানের দরজারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো ও অন্ধকারে। কি করবে ও ভাবতে পারছে না। নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। নিরুপমের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ওর মন বলে উঠলো, আমি সেই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে চাই না। ওর মন বলে উঠলো, আমি আরো সুন্দর সেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।

নিরুপম দরজায় হাত রেখে দাঁড়ালো। ওর ইচ্ছের দরজায় হাত রেখে একটু ঠেলে দেখতে যেতেই দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে, নিঃশব্দ অন্ধকার ঘরের দরজা।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল, দুটো মুক্তো ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে ছুটে আসতে আসতে দুটো জ্বলন্ত চোখ হয়ে গিয়ে তীব্র ঘৃণায় বলে উঠলো, তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা করে।

নিরুপম নিঃশব্দে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে এলো।

॥ চৌদ্দ ॥

আর একটা দিন, একটাই তো দিন। তারপর রূপা চলে যাবে। আমি চলে যাচ্ছি নির্পমদা। রতনবাবু ফোন করেছিলেন, কাল সকালেই এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।

রূপা চলে যাবে, চলে যাবে। কোন কথাই আর নিরুপমের কানে যাচ্ছে না।

খুব ছোটবেলায় ও একটা পাখি পুষেছিল, নিরুপমের বাবা চকবাজার থেকে একটা খাঁচা কিনে এনেছিলেন। পাখিটা ওর প্রাণের চেয়েও আপন হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুধা কবে যেন খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু পাখিটা উড়ে যাওয়ার পরও শূন্য খাঁচাটা বহুদিন ওদের লালচকের বাড়ির বারান্দায় ঝুলতো, বাতাসে দুলে দুলে উঠতো, আর সেদিকে তাকিয়ে নিরুপমের মনে হত পাখিটা আবার কোন দিন ফিরে আসবে, আবার কোনদিন হয়তো শিস দিয়ে উঠবে।

কিন্তু রূপা চলে যাবার পর এখন তো নিরুপমকেই খাঁচাটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ছিল নিরুপম। হঠাৎ দেখলে, রাস্তার মোড়ের যে গুলমোহর গাছটা ফুলে ফুলে আলো হয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ফুলগুলো টুপটাপ বৃষ্টির মত ঝরে ঝরে পড়ছে, নীচে রাস্তার ওপর, গুলমোহরের পায়ের কাছের চারপাশের আঙিনায়, রাস্তাটা

আলো হয়ে গেছে, কিন্তু গাছের শাখা-প্রশাখায় একটাও ফুল নেই।

সকাল থেকেই বিষণ্ণ মুখে রূপা এক-একবার এসে দাঁড়াচ্ছে। এই তো এইমাত্র খাটের বাজুতে ডান হাতটাকে একটা পাক দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও ম্লান হেসেছিল।—একবার যেও নির্পমদা, একবারটি।

নিরুপম কি উত্তর দেবে ভেবে পায়নি। শুধ দুঃসহ ব্যথার মধ্যেও নিরুপম মুক্তির রেশ অনুভব করেছিল। মুক্তি, মুক্তি! ওর সেই পাপবোধ থেকে রূপা ওকে চিরকালের জন্যে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে সেই পুরনো পাপ এখন বিশুদ্ধ প্রেম হয়ে গেছে।

এখন রূপা ওর কাছে রহস্য নয়। নিরুপম মনে মনে বললে, রূপা আমি জেনে গেছি, তুমি এতকাল স্মৃতির উইঢিবি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই পাপকে কবে যেন প্রেমে পরিণত করে দিয়েছো। তোমার ঘৃণার মুঠো থেকে ছিটকে পড়া মুক্তোর আংটিটাই তো আমার সেই অবাক সুন্দর পৃথিবীর প্রথম সাক্ষী ছিল, তুমি তাকে পরম আদরে তুলে নিয়েছিলে। ভেবেছিলে, ওটা আমি তোমাকেই দিতে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, ওটা তুমি আমাকেই দিতে গিয়েছিলে, তাই না?'

নিরুপম ভাবলো, রূপা ঐ ইচ্ছের দরজাটাকে খুলে রেখে বলতে চেয়েছে নিরুপমের জন্যে ওর মনের দরজা ও চিরকালই খুলে রেখেছে, নিরুপমকে ও কোন দিনই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তবু গতরাত্রির কথা মনে করে নিরুপম কিছুতেই রূপার চোখে চোখ রাখতে পারছিল না।

ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপাকে ওর যে কত কি বলার কথা ছিল, কিছুই বলা হল না।

অপিসের পোশাক পরে টাই হাতে নিয়ে ও নিজে থেকেই

বললে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবো রূপা, তাড়াতাড়ি ফিরবো। ওর কেমন মনে হলো রূপা সেদিনের মত মুখ ফুটে বলতে পারছে না।—আর একটাই তো দিন, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে তো!

না, তার বদলে রূপা ম্লানমুখে এগিয়ে এলো নিরুপমের সামনে, একেবারে সামনে। ওর হাত থেকে টাইটা কেড়ে নিয়ে বললে, পারবো নির্পমদা, এবার নিশ্চয় পারবো। ও হাসবার চেষ্টা করলো।

ওর হাত থেকে টাইটা কেড়ে নিয়ে সেটা নিরুপমের কাঁধের ওপার থেকে ঘুরিয়ে এনে রূপা একটা হ্যাঁচকা টান দিলো।—একটু তো ঘাড়টা নোয়াবে, আমি কি তোমার সমান নাকি? —বলে হাসবার চেষ্টা করলো। আর নিরুপম বুঝতে পারলো, রূপা ওর ভেতরটা লুকোবার চেষ্টা করছে।

ঠিক তখনই রূপার কথাটা ওর মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করলো। 'একটু তো ঘাড়টা নোয়াবে, আমি কি তোমার সমান নাকি।' কথাটার মধ্যে আরো কোন অর্থ আছে কি না ভাববার চেষ্টা করলো নিরুপম। কি বলিতে চাইছে রূপা? নাকি এ কথাটাই সেদিন রূপাদের বাড়ি থেকে চলে আসার পর থেকে ও গোপনে গোপনে উচ্চারণ করেছে। ক্ষমা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, গভীর গভীরতম ভালবাসায়।

ধীরে ধীরে হয়তো একটু বেশি সময় নিয়েই টাই বেঁধে দিল রূপা, তারপর একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ দু' পা পিছিয়ে এসে পরম কৌতুকে দু' কোমরে দুটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস মুখে বললে, এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে একটু দেখে নিই।

ওর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি দেখে, ওর তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটি দেখে নিরুপম না হেসে পারলো না। কিন্তু নিরুপমের ভীষণ ভাল লাগলো।

সারাটা দিন ওর কেবলই মনে হচ্ছিল রূপা চলে যাবে, চলে যাবে। ও আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ এক সময় ভাবলো, দ্যাখো, দ্যাখো, এ কটা দিন কি অস্বস্তির মধ্যে আমি কাটিয়েছি। অবনীবাবু, ঝুমারা, চারপাশের ফ্ল্যাটের লোকের কাছে নিজের চেহারাটা নিখুঁত পরিপাটি রাখার জন্যে কত কি দুর্ভাবনা ছিল। অলকাকে ভয়. কি জানি কি বলে বসে। কিন্তু এখন আর নিরুপম কারো কথা ভাবছে না, ভয় সরে গেছে। আসলে ওর পাপবোধ ওকে ভয় দেখাচ্ছিল। যে মুহূর্তে সেটা সরে গেছে, দুর্ভাবনা আর অস্বস্তিও কেটে গেছে তখন থেকেই।

সত্যি সত্যি তাড়াতাড়ি অপিস থেকে ফিরে এলো নিরুপম।

ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসেছিল ও। বেতের মোড়াটা টেনে এনে একপাশে বসলো রূপা। নিরুপম দেখলো, রূপা খুব সুন্দর করে সেজেছে। চুলে দুটি সবুজ পাতা, একটি রক্তিম ফুল। সামনে ছড়িয়ে দেওয়া দুটি সুন্দর পা, শ্বেতশুভ্র দুখানি কোমল স্ফটিকের হাত কোলেব ওপর অলস পড়ে আছে।—তুমি তো আমাকে একবারও থাকতে বলছো না।

নিরুপম কোন উত্তর না দিয়ে হাসলো। খেলা, খেলা। ও বুঝতে পারছে রূপা আজ খেলার নেশায় মেতে উঠেছে। রূপা আজ শাড়ির পাকে পাকে ওর সুছন্দ শরীরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে। যেন তুলে ধরতে চাইছে আরতির সুগন্ধি ধূপদানির মত, পরমান্নভোগ আতপের অর্ঘ্যের মত।

তুমি তো আমাকে একবারও থাকতে বলছো না!

রূপা হঠাৎ হেসে উঠে বললে, আমি বোধহয় ফুরিয়ে গেছি, না নির্পমদা?

কিন্তু কিছুই তো ফুরিয়ে যায় না, কেউই ফুরোয় না। ধূপের গন্ধের মত তা ঘ্রাণের মধ্যে বেঁচে থাকে।

—আজ আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ বেড়াবো, অনেকক্ষণ। রূপা বলেছিল।

সারাক্ষণ, সারা সন্ধ্যা ওরা বিস্মৃত কোলাহল নির্জনতার মধ্যে দুজনে পাশাপাশি, কখনো হাতে হাত, একবার আলতো ভাবে নিরুপম ওর পিঠে হাত দিয়েছিল, দুজনে মুখোমুখি ঘাসের ওপর বসে নিশ্চুপ, দুজনেই হাঁটুতে থুতনি রেখে উদাস অন্য-মনস্কতায়, অন্ধকারে ভাঙা আলাপ, উচ্চকিত হাসি, উদ্ধত ট্রানজিস্টার ম্লান নিঃশব্দ হয়ে গেছে ওদের তন্ময়তার কাছে, নিরিবিলি গাছের অন্ধকার ছায়ার আড়ালে আলোর জোনাকিরা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, কালো কালো জলের ওপর সাদা ডুরে আলোর ছায়ারা চোখ থেকে নিভে গেছে, কি এক নির্বাক অতলতায় ডুবে গেছে দুজনে। কি যেন চাওয়ার ছিল, এই আলো-আড়াল অন্ধকারের পবিত্রতায় কি যেন বলার ছিল, দুজনেই ভুলে গেছে।

নিরুপম ভাবলো, সময় নেই, সময় ওর করতলে ধৃত জলের মত আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। রূপা কাল চলে যাবে, একটা অসীম শূন্যতা ফেলে রেখে, কিংবা ধূপের গন্ধ।

পাশাপাশি ঘন হয়ে বসা ঘাসের আসনে দুজনে দুটি অতলান্ত দীর্ঘশ্বাস সযত্নে রেখে দিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়ালো। একটি নিঃসঙ্গ গাছের অন্ধকার ছায়ায় দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

নিরুপমের মন বলতে চাইলে, রূপা, আজ তোমার কাছে আমার একটি সামান্য প্রার্থনা। আমি ভেবেছিলাম সেই সুন্দর পবিত্রতার মধ্যে ফিরে যাবো। কিন্তু ফেরা যায় না, ফেরা যায় না। শরীরের দরজায় পৌঁছে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না। রূপা, ক্ষমার স্নিগ্ধ ছায়ায় তুমি আমার পাপকে প্রেমে পরিণত করে দিয়েছো, আজ একবার ওষ্ঠের উত্তাপে তাকে স্মৃতির অগ্নিশিখা করে নিতে দাও।

আর একটা দিন, একটাই তো দিন। তারপর রূপা চলে যাবে।

রাস্তার মোড়ের গুলমোহর গাছটার দিকে আর কারো চোখ পড়বে না। গাছটার শেষ কুসুমের দিন পার হয়ে গেল, পায়ের তলায় ছড়িয়ে থাকা আলো হয়ে যাওয়া ফুলের বিছানা সরে যাবে। তারপর আর কেউ গাছটার দিকে তাকাবে না। কারণ, তখন ঐ গুলমোহর একা এবং নিঃসঙ্গ, কিংবা রাস্তার ধারের সারি সারি বিবর্ণ গাছের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে শুধুই একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে একটা নিসর্গ দৃশ্যের মত।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

খাবার টেবিল থেকে এক সময় ধীরে ধীরে উঠেছে দুজনেই খাবার ঘর থেকে, বেরিয়ে দুজনেরই তখন মনে হচ্ছে এখন তো শুধুই একটা রাত্রির দেয়াল কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরই ওরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কি যেন বলার ছিল, বলা হয়ে উঠলো না।

নিরুপমের ঘর, বুবুনের ঘর। পাশাপাশি। বারান্দায় ওরা দাঁড়ালো কয়েক পলকের জন্যে। নিরুপমের ঘরের দরজায় নিরুপম, বুবুনের ঘরের দরজায় হাত রেখে রূপা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে নিমেষের জন্যে তাকালো। মনে হল, রূপার বিষাদের দৃষ্টিতে কি যেন এক মায়াময় রহস্য, বিষণ্ণ হাসিতে বেদনার সুর। ওরা কেউই বোধ হয় কারো দৃষ্টিকে সহ্য করতে পারলো না। দরজা খুলে দুজনেই ভিতরে ঢুকে গেল। মনের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা দুটি মানুষ পরস্পরের কাছ থেকে অসীম দূরত্বে চলে গেল, দৃষ্টির নাগালের বাইরে।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

নিরুপমের চোখে ঘুম নামছে না। ওর মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে লালচকের আকাশে আকাশে, কবুতরবাগে

রামলীলার মাঠে, চকবাজারে মিঠাইয়ের দোকানে। মিশিরজীর মন্দিরে মা'র নামে পুজো দেবো, মা হাসপাতালে সেরে উঠুক, নিরুপম উইটিবি খুঁড়ছে, ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা....

মাথা নিচু করে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল নিরুপম। জন্তু, জন্তু, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়।

হঠাৎ সেই চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল নিরুপমের।

ও তো আর কোনদিন রূপার কাছে ফিরে যেতে পারেনি। গ্লানির অপমানের মুখ নিয়ে কি করে ফিরে যাবে ও রূপার কাছে। যায়নি, যেতে পারেনি।

শুধু সুধার কাছ থেকে, মার কাছ থেকে, অনেক দিন পরে একবার জানতে পেরেছিলাম রূপার বিয়ে রে, এই তো এই সপ্তাহে। তুই তখন কত যেতিস বুলাদের বাড়ি, এখন তো ভুলেই গেছিস, ওদের রূপার বিয়ে এই সপ্তাহে।

নিরুপম মার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি।

সুধা বলেছিল, আমরা সবাই যাবো, তুই যাবি তো দাদা!

নিরুপম কোন উত্তর দেয়নি, ও জানতো, ও যেতে পারবে না।

তারপর একদিন কবুতরবাগের পাশ দিয়ে ও হেঁটে চলেছে, হঠাৎ মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী চিৎকার করে ডাকলে, ভাইয়া, নির্পম ভাইয়া। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো। ওর হাতে একখানা চিঠি দিল তাকালো একবার ওর চোখের দিকে, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

'জন্তু,

আমি তো চলে যাচ্ছি। হয়তো আর কোন দিনই দেখা হবে না। যাবার আগে একবারটি অন্তত আসবে। জন্তুর মুখটা কতদিন আমি দেখিনি।'

চিঠিটার কথা আজ এখন মনে পড়তেই নিরুপমের সমস্ত

শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। বোকা, বোকা, নিরুপম নির্বোধ, অহঙ্কারী। কিম্বা আত্মগ্লানিতে জর্জর সেই প্রথম যৌবনের নিরুপম কিছুই জানতো না, বুঝতো না। তাই অসীম লজ্জায় ওর ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। আজ এখন সেই চিঠিটা অন্য অর্থ নিয়ে এসেছে। জন্তু, জন্তু, নিজের মনে মনে শব্দটা আওড়ালো নিরুপম। মনে হল এমন স্নেহ প্রেম আদরের অন্তরঙ্গ ডাক ও কোনদিন শোনেনি।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

ঘুম আসছে না নিরুপমের। ঘুম আসবে না।

আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ওই তো রূপা ওর পাশের ঘরেই, বুবুনের ঘরে। রূপা কি এখনো ঘুমোয় নি। হঠাৎ একবার মনে হল যেন রূপার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। রূপা কি আলো নিবিয়ে দিয়েছে! নিরুপম মনে করার চেষ্টা করলো, ও ঘরের সুইচ টিপে আলো নেবানোর শব্দ ওর কানে এসেছিল কিনা।

জন্তু, জন্তু, জন্তুর মুখটা কতদিন আমি দেখিনি।

নিরুপমের শরীরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা খেলে বেড়াচ্ছে। রূপা, তোমার কাছে আমার একটা সামান্য প্রার্থনা। ওষ্ঠের উত্তাপে আমার স্মৃতিকে তুমি অগ্নিশিখা করে নিতে দাও।

পাশাপাশি দুখানা ঘরের মাঝের দরজাটার দিকে তাকালো নিরুপম। তাকিয়ে রইলো। আর তখনই লক্ষ্য করলো বিপিন কখন দরজাটায় এদিক থেকে খিল তুলে দিয়ে গেছে।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে।

অনেক দিন আগে ট্রামে যেতে যেতে কলকাতার রাস্তায় একটা সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিল নিরুপম। গ্রীষ্মের

দুপুরে চলন্ত ট্রামে বসে চকিতে দেখা এক টুকরো ছবি। এক পলকের।

হঠাৎ সেই নগ্নিকা মূর্তির দিকে চোখ পড়েছিল ওর। রাস্তার কলের সামনে দাঁড়িয়ে শনের মত পাকা চুল এক বুড়ি ভিখিরি মা তার পাগল হয়ে যাওয়া যুবতী মেয়েকে জোর করে স্নান করাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিবসনা একটি ঋজু নারীদেহ উন্মাদের চোখে তাকিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিখিরি মা পরম স্নেহে পরম আদরে পাগল মেয়ের কাদামাখা নোংরা শরীরে তার পিঠে কাঁধে স্তনে ত্রিবলীতে সাবান ঘষতে ঘষতে জল ঢেলে দিচ্ছে। সেই নগ্নিকা নিরুপমের চোখে সেদিন একটি ভাস্কর্য মূর্তি হয়ে উঠেছিল।

মাঝে মাঝেই সেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একই সঙ্গে কুৎসিত আর সুন্দর মনে হয়। একদিন ছবিটা ও স্বপ্নে দেখেছিল ; স্বপ্নের চোখে সেই পাগল ভিখিরি মেয়েটা হঠাৎ কিভাবে যেন একটু একটু করে বদলে যেতে লাগলো, বদলে গিয়ে প্রথম যৌবনের চোখে দেখা আরেকজনের মুখ হয়ে গিয়েছিল। রূপার। আজো সেই ছবিটা যেন একটু একটু করে বদলে যেতে চাইছে।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার। আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র, তারপরই কাল সকালে রতনবাবু এসে ওকে নিয়ে যাবেন।

দূরে কোথায় একটা ট্রাম যেন ঘন্টি বাজাতে বাজাতে তীব্রবেগে ছুটে গেল।

নিরুপম কি করবে বুঝতে পারছে না। বোধহয় ফেরা যায় না।

মাঝের দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, নিরুপম বুঝতে পারল না।

রূপা কি আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? জানে না,

নিরুপম জানে না।

' ধীরে ধীরে উঠলো নিরুপম। নিঃশব্দ পায়ে দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

দরজায় হাত রাখলো। নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাকে একবার ভাল করে দেখি, 'জন্তু, জন্তু', সমস্ত চিন্তাগুলো ওর মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। ছ্যাখো ছ্যাখো, ঠিক আমাদের জীবনের মতই, প্রেম ভালবাসার মতই। একটার নাম দাও শরীর, আরেকটা তোমার মন। মাঝখানে একটা দরজা আছে, আছেই। তুমি যতই সেটা খিল দিয়ে আটকে রাখো, তোমার চোখ বার বার বার সেদিকে যাবেই। আনাগোনার জন্যেই তো ওই মাঝের দরজাটা। তুমি কোন্ ঘরে আছো, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে ওই দরজাটার অন্য ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছে।

দরজায় হাত রেখে নিরুপম ভাবলো ধীরে ধীরে দরজায় টোকা দিয়ে ও ডাকবে কিনা, রূপা রূপা!

ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

গলার টাই ধরে টান দিয়েছিল রূপা।—এই, ঘড়িটা তো নোয়াবে একটু, আমি কি তোমার সমান নাকি?

নিরুপমের মনে হচ্ছে, রূপা যেন ওকে টানছে।

দরজায় হাত রেখে ভাবতে ভাবতে নিরুপম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা ঝট্কা টানে খিলটা খুলে ফেললো, নিস্তব্ধতার মধ্যে খিল খোলার আওয়াজ নির্লজ্জের মত ফেটে পড়লো।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দতার মধ্যে।

তারপর হঠাৎ একসময় নিরুপম ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতে গেল। তার তখনই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওদিক থেকে শব্দ করে দ্রুত হাতে খিলটা তুলে দিল।

কে আবার। রূপা।

একটা মুহূর্তের জন্যে নিরুপমের সমস্ত মুখ লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সেটা উল্লাস হয়ে গেল। মনে মনে বললে, রূপা, আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ।

আমি জানি, তুমি ঘুমোও নি। তুমিও আমার মত অস্থির হয়েছিলে। দরজার এপারে দাঁড়িয়ে থরথর করে যখন আমার শরীর কাঁপছিল, তখন দরজার ওপারে তুমিও নিশ্চয় আমার মতই বুকের মধ্যে গভীর গভীরতম প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। তীব্র কোন লজ্জাবোধ এসে তোমাকে সেই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এখন আমরা দুজনেই স্মৃতিতে ফিরে যেতে পারবো।

রূপা, আমি কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ।

॥ পনেরো ॥

নিরুপম এখন আবার সেই গ্রুপ ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

রূপা চলে গেছে। রতনবাবু এসে রূপাকে নিয়ে গেছেন। ওঁর ছুটি ফুরিয়ে গেছে। রূপার ছুটি হয়ে গেছে। এখন কানপুরে ফিরে গিয়ে রূপাও একখানা গ্রুপে ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

নিরুপম এখন একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে। ওর বুকের ওপর থেকে সেই ভারী পাথরখানা সরে গেছে, যেটা ওকে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পেত না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই পাথরের ভারে নুয়ে পড়তো, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। এখন ও মুক্তি পেয়ে গেছে, এখন ও আবার অ্যালবামে ওই গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে ফিরে যাবে।

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ওই একখানা ছবিতেই ও নিজেকে খুঁজে পাবে। আর সব ছবিগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে। এই ছবিটায় তোমাকে খুব ইনোসেণ্ট ইনোসেণ্ট দেখায়। মিথ্যে কথা। এই ছবিটায় টাই-বাঁধা একজন রাশভারী মানুষ। মিথ্যে কথা। ওগুলোর কোনটাই নিরুপমের ছবি নয়। শুধু এই, এইখানে, অলকা হাসছে, বুবুন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে, বুকের ওপর হাত দু'খানা আড়াআড়ি, ইলুর চোখ লাজুক, লাজুক, শুধু এই, এই ছবিতে, নিরুপমের বাবা আর মা ঠিক ছবি তোলানোর

ভঙ্গিতে ওই তো সুধা, ভুরু কুঁচতে দাঁড়িয়ো, আরো কে কে যেন, আরো অনেক, ছাখে ছাখো এই ছবিটিতেই শুধু মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে তুমি আছো।

রূপা চলে গেছে। রতনবাবু এসে ওকে নিয়ে গেছেন। কানপুরে ফিরে গিয়ে সকলের মধ্যে রূপাও একখানা গ্রুপ ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

এখন এই তিনতলার ফ্ল্যাটখানা নিরুপমের চোখে যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই তো সেই বেতের মোড়াটায় রূপা পা ছড়িয়ে বসেছিল, দুটি সাদা হাত কোলের ওপর মেলে রেখে।

কাঁধের ওপর রূপার হাতের স্পর্শটা যেন এখনো অনুভব করছে।—ভেবেছিলাম সেই জাহাজে করে কোথাও যাবো অনেক দূরে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কবুতরবাগের বর্ষার জল উপচে পড়া খরস্রোত নালাটায় কাগজের নৌকা ভাসাতে ভাসাতে রূপা বলছে।

এই তো এখানে, খাটের একপাশে, খাটের বাজুতে পিঠ দিয়ে বসেছিল রূপা। কিংবা ওই খাবারের টেবিলে হাত মেলে রেখে বলছে, আমি বলছিলাম না, ফেরত দেবো না, তোমাকে কক্ষনো ফেরত দেবো না।

অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে যাবে নিরুপম। একটার পর একটা। না, অ্যালবামে রূপার কোন ছবি খুঁজে পাবে না। এই তো অলকার ছবি, ও একা, কপালে গালে চন্দনের ফোঁটা, লাল বেনারসী, বিয়ের সময়ে তোলা, ওটার মধ্যে আছে কি না নিরুপম জানে না। বাবার ছবি, মার ছবি, এক এক পাতায় এক একজনের ছবি রয়েছে ; কিন্তু এগুলো কোনটাই বোধহয় কারো ছবি নয়। কারণ একা একা একটা মানুষের কোন ছবি তোলা যায় না।

নিরুপম মানে শুধু নিরুপম নয়। ওর চারপাশের আরো অনেকে। ক্যামেরার মধ্যে যাদের ধরা গেছে, শুধ গ্রুপ ফটোগ্রাফের তারাই নয়, যারা বাদ পড়ে গেছে, সেই উইঢিবি, নিশীথের কুৎসিত হাসি, সর্সতী ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকছে, মৃগাঙ্কবাবুর হাতে এক বাটি মাংস, দত্ত সাহেব চিরকুটটা দিয়ে বলছেন, আমার ক্যাণ্ডিডেট, দাসবাবু শুকনো মুখে হাসছেন, দু'দিন বাদে ছেঁড়া' পাঞ্জাবিতে দেখলে চিনতে চাইবেন তো? 'এরা সকলেই ঠেলাঠেলি করে অ্যালবামের গ্রুপ ফটোগ্রাফখানার মধ্যে জায়গা চাইছে, ওই ছবিটা দিনে দিনে যত ম্লান হলুদ হয়ে যাবে, ততই ওরা ঠেলাঠেলি করে ওর মধ্যে জায়গা করে নেবে।

এখন, এইমাত্র রূপা ছুটে এসে টাইটা কেড়ে নিলো।

ব্যাডমিণ্টন খেলার মাঠে বসে সন্ধার ছায়ায় রূপা বলছে, এই, সত্যি বলবে, তুমি কাউকে ভালবাসো? যমুনা তো, জানি জানি। এখন আবার রূপা বলে উঠেছে, নির্পমদা, এই খাঁচার নধ্যে কি করে থাকো গো।

কিন্তু এই সুখের খাঁচাটাতেই তো মানুষ বার বার ফিরে যেতে চায়। নিরুপম নিজেও। শুধু মাঝে মাঝে কি যেন বলে উঠতে ইচ্ছে করে, তখন ও দক্ষিণের জানালাটায় এসে দাঁড়ায়। অ্যালবামের পাতা উল্টে যায় মনে মনে।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে, নিরুপম দাস বাবুকে যেন বলছে, যাকে যোগ্য মনে করেছি, সিলেক্ট করেছি।

হঠাৎ নিরুপমের মনে হল, ও একটা স্বচ্ছল সুখী মানুষকে দেখতে পাচ্ছে, যে কেবলই মাথা তুলতে চাইছে, কিন্তু পাথরের ভারে মাথা তুলতে পারছে না। মানুষটা কেবলই একটার পর একটা বিশাল পাথরের ভারে নুয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ পাথরগুলো রঙ বদলে বদলে, মাটি হয়ে গেল। আর তখন মানুষটাকে চেনাই যায় না। দেখে মনে হয় যেন একটা উইঢিবি।